মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৮, সংখ্যা-১০

নভেম্বর ২০১৯ ইং, রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হি., কার্তিক ১৪২৬ বাং

ربيع الاول ١٤٤١ھ، نوفمبر ٢٠١٩م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৫৯..... ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৬
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
আকাবীরদের ইহসান ভোলা যাবে না..... ৭
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
সীরাতে রাসূল (সা.)-এর আলোকে
জুমু'আর দিনের আমল..... ১১
শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.
পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে
'খতমে নবুওয়াত' আকীদা-৯..... ১৪
শারেহুল হাদীস আল্লামা রফীক আহমদ
নারী-পুরুষের নামায আদায়ের পদ্ধতি কি এক?..... ২১
মুফতি কিফায়তুল্লাহ শফিক
পবিত্র সীরাতে নামাযের গুরুত্ব..... ২৬
মুফতী শরীফুল আজম
নগরায়ণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগান্তকারী পরিকল্পনা..... ৩৪
মুফতী মাহমুদ হাসান
সময় বদলে দেয় জীবন..... ৩৯
মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
উম্মাহর ঐক্য সাধনে রাসূল (সা.)-এর কর্মনীতি..... ৪২
মাওলানা সুহাইলুল কাদের
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৭

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

ভোলা ট্র্যাজেডি ও রাষ্ট্রের করণীয়

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের কাছে নিজের জান, মাল, আত্মীয়-স্বজন এবং দুনিয়ার সব কিছু থেকেই প্রিয়। ইসলামের এটিও একটি বড় মুজিযা যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং তাঁর নির্দেশ পালনে মানুষ নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করে না। সাহাবায়ে কেরাম তো এর জ্বাজল্যমান প্রমাণ আছেই, এতদ্‌পরবর্তী আজ পর্যন্ত মুসলমানদের অনুভূতি এমনই। এসব বিষয় আল্লাহপ্রদত্ত। এখানে মানুষের ইচ্ছাশক্তির হাত নেই।

সাধারণত মানুষের মাঝে স্বকীয় অনুভূতি, ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো এমনই হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো মহামানবের ভালোবাসা এবং নির্দেশ পালনে পুরো একটি মানবগোষ্ঠী নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং বাস্তবে তা করে দেখানোর নজির একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)। তাই সব ধরনের অনুভূতিকে এক করে দেখার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। সে কারণে ইসলামী আইনে ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা, রাসূল (সা.) ও ইসলাম অবমাননার সর্বোচ্চ শাস্তির বিধানসহ দীর্ঘ ব্যাখ্যা তাতে বিদ্যমান।

বর্তমান যুগে ইসলাম ধর্ম, আল্লাহ ও রাসূলের অবমাননার পেছনে অন্যান্য উদ্দেশ্যের পাশাপাশি মুসলমানদের মাঝে উত্তাপ ছড়িয়ে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার, রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো ইত্যাদি উদ্দেশ্যও থাকতে পারে বলে বিভিন্ন মহলের ধারণা। সে কারণে এটি যেমন ধর্মীয় অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত তেমনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ারও শামিল। তাই এই ব্যাপারে সরকারের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে বলেই আমরা মনে করি। ইসলাম এই বিষয়ের স্পর্শকাতরতা ও গুরুত্বের দিক লক্ষ করে যেমন সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করেছে, তেমনি সরকার চাইলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করতে পারে, যা উম্মাহর দীর্ঘদিনের দাবিও বটে।

ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে কঠোর আইন নতুন কিছু নয়। তবে একসময় রাজারাজরাগণ ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য এই আইনের অসাধু প্রয়োগ করত বলেই বিভিন্ন দেশ এই আইন বাতিল করেছে। বিভিন্ন দেশে এখনও এই আইন বলবৎ রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এসংক্রান্ত যে আইন বর্তমানে আছে তার সঠিক প্রয়োগ হলেও ধর্ম অবমাননার সাহস কেউ করতে পারত না।

বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম অবমাননার আইনের ধারাসমূহ এ রকমই : বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫(ক) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অসদুদ্দেশ্যে লিখিত বা মৌখিক বক্তব্য দ্বারা কিংবা দৃশ্যমান অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সংশ্লিষ্ট ধর্মটিকে বা কারো ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অবমাননা করে বা অবমাননার চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ১৮৬০ সালের মূল আইনে এ ধারাটি ছিল না। পরবর্তীতে ১৯২৭ সালে এক সংশোধনীর মাধ্যমে এ ধারাটি যুক্ত করা হয়।

১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯(ক) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সংবাদপত্র যদি রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কিছু বা এমন কিছু প্রকাশ করে, যা নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা তৈরিতে উস্কানি দেয় কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানে, সে ক্ষেত্রে সরকার ইচ্ছা করলে ওই সংবাদপত্রের সংশ্লিষ্ট কপিগুলো বাজেয়াপ্ত করতে পারে। তবে সরকারি এ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করতে পারবেন।

২০০৬ সালে প্রণীত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশসংক্রান্ত অপরাধ ও তার দণ্ড বলা হয়েছে। উল্লিখিত ধারা অনুসারে, কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করে, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি দান করা হয়, তাহলে তার এ কাজ হবে একটি অপরাধ। কোনো ব্যক্তি এ অপরাধ করলে অনধিক দশ বছর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

সংবিধানের এসব ধারাসমূহের ভিত্তিতেও যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারীদের সঠিক বিচার হয় তবে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভোলা ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি হবে না এবং ভোলার চার শহীদের ন্যায় তাজা তাজা প্রাণগুলো খসে পড়বে না।

আমরা এরূপ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই, শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, তাদের পরিবার-পরিজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য দু'আ করি।

সরকারের উচিত হবে, এই বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করা এবং স্থায়ীভাবে যেন ধর্ম অবমাননার মতো চরম গর্হিত কাজ রোধ হয়–সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৫/১০/২০১৯ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٨)

১৫। হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। ১৬। এর দ্বারা আল্লাহ যারা তার সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। ১৭। নিশ্চয়ই তারা কাফির, যারা বলে মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয় তবে বলো–যদি আল্লাহ মসীহ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি, যে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে সব কিছুর ওপর আল্লাহ তা'আলার আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সব কিছুর ওপর শক্তিমান। ১৮। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টি মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে খ্রিস্টানদের একটি উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে–যা তাদের এক দলের ধর্মবিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ হযরত মসীহ (আ.) (মাআযাল্লাহ) হুবহু আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে খ্রিস্টানদের সব দলের একত্ববাদবিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ (আ.)-এর খোদার সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হোক।

এ স্থলে হযরত মসীহ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দুটি রহস্য থাকতে পারে। এক. আল্লাহ তা'আলার সামনে মসীহ (আ.)-এর অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খিদমত ও হিফাজত তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকে রক্ষা করতে পারেন না। দুই. এতে ওই সম্প্রদায়ের ধর্ম-বিশ্বাসও খণ্ডণ করা হয়েছে, যারা মরিয়মকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

এ স্থলে হযরত মসীহ ও মরিয়ামের মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কোরআন অবতরণের সময় হযরত মরিয়মের মৃত্যু ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল না, বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ تغليب অর্থাৎ আসলে হযরত মসীহ (আ.)-এর মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর মৃত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে–যদিও তাঁর মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আমি মরিয়মকে যেমন মৃত্যু দান করেছি, তেমনি হযরত মসীহ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। يخلق ما يشاء বাক্যের খ্রিস্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খণ্ডন করা হয়েছে। হযরত মসীহকে খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধু মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন।

আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছ সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন : مثل عيسى عند الله كمثل ادم আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিয়মের বাইরে মসীহ (আ.)-কে সৃষ্টি করা তার খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। লক্ষণীয় যে, হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। তিনিই স্রষ্টা ও প্রভু ও ইবাদতের যোগ্য। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

মুসলিম দুনিয়ায় সর্বাধিক পঠিত অন্যতম কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৫৯

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক 'আল-আবরার'। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দু ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে কোরআন–চল্লিশ হাদীস :

হাদীস নং-৩৬ :

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " :ثَلَاثَةٌ لَا يَهُولُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ هُمْ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكٍ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ :رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِهِ , وَدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ , وَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি এমন হবে, যারা কিয়ামতের ভয়ংকর বিপদেও ভীত হবে না। তাদের হিসাব-নিকাশও দিতে হবে না। সমস্ত মাখলুক যখন তাদের নিজ নিজ হিসাব-কিতাবে ব্যস্ত থাকবে তখন তারা মেশকের টিলার ওপর আনন্দ করবে। প্রথমত, ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরআন শরীফ পড়েছে এবং এমনভাবে ইমামতি করেছে যে, মুক্তাদিগণ তার ওপর সন্তুষ্ট ছিল। দ্বিতীয়ত, ওই ব্যক্তি যে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে নামাযের দিকে ডাকে। তৃতীয়ত, ওই গোলাম যে নিজের রব এবং মুনিবের হক আদায় করে।

(আল মুজামুল আওসাত [তাবারানী] ৯/২০৯, হা. ১১১৬, আল মুজামুস সাগীর ২/১২৪, [শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/৩৮২, হা. ১৮৪৭)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং-৩৭ :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا أَبَا ذَرٍّ، لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ

হযরত আবু যর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, হে আবু যর! তুমি যদি সকাল বেলায় গিয়ে কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিক্ষা করো; তবে তা একশত রাক'আত নফল নামায হতে উত্তম। আর যদি ইলমের একটি বিষয় শিক্ষা করো চাই তার ওপর আমল করা হোক বা না হোক; তবে তা হাজার রাক'আত নফল নামায হতে উত্তম।

(সুনানে ইবনে মাজাহ ১/১৪২, হা. ২১৯)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক.

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আলেমের ফজীলত আবেদের ওপর এমনি, যেমন আমার ফজীলত তোমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির ওপর।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ

الـرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ :ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُـولُ الـلَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَـضْـلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ

(তিরমিযী শরীফ ৫/৪৮, হা. ২৬৮৫)
হাদীসটির মান : সহীহ
খ.
অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে, শয়তানের নিকট একজন আলেম হাজার আবেদের চেয়ে কঠিন।

حَـدَّثَـنَـا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْـنُ جَـنَـاحٍ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَـنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :-فَـقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

وأخرجه الترمذى (٢٨٧٦) من طريق موسى بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد .وقال :هذا حديث غريب

(তিরমিযী শরীফ ৫/৪৬, হা. ২৬৮১, ইবনে মাজাহ শরীফ ১/১৪৫, হা. ২২২, মুজামুল কাবীর [তাবারানী] ১১/৭৮, হা. ১১০৯৯, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/২৩২, হা. ১৫৮৬)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং-৩৮ :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْـنُ إِبْـرَاهِيـمَ بْنِ كَثِيرٍ الصُّورِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَـمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُـرَيْـرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :قَـالَ رَسُـولُ الـلَّـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَـنْ قَـرَأَ عَشْـرَ آيَـاتٍ فِى لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো রাতে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে সে ওই রাতে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হবে না।

(মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৭৪২, হা. ২০৪১, সুনানে দারামী, হা. ৩৪৮৫, আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী], হা. ৭৭৪৮, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী], হা. ২০০৩)
হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-৩৯ :

ثـنـا أَحْـمَـدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَخْبَـرَنَـا أَبُـو حَـمْـزَـةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَـرَأَ فِـى لَيْـلَةٍ مِـائَةَ آيَةٍ لَـمْ يُـكْتَـبْ مِـنَ الْغَافِلِينَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায নিয়মিত আদায় করবে সে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে সে ওই রাতে কানেতীনদের (অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারী) অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সহীহে ইবনে খুযাইমা ২/১৮০, হা. ৪৮১, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৫২, হা. ১১৬০)
হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-৪০ :

عـن ابن عباسؓ قال نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله ﷺ فـاخبـره انه ستكون فتن قال فما المخرج منها يا جبرئيل قال كتاب الله۔

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত জিরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সংবাদ দিলেন, বহু ফেতনা প্রকাশ পাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো হতে বেঁচে থাকার উপায় কী? তিনি বললেন, কোরআন শরীফ।
(রযীন)
হযরত আলী (রা.) বর্ণিত একই অর্থবোধক একটি হাদীসে আছে :

حَـدَّثَـنَـا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ :وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْـنُ كَـعْـبٍ الْقُرَظِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَعْوَرِ، قَالَ :قُلْتُ: لَآتِيَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ عَمَّا سَمِعْتُ الْعَشِيَّةَ .قَالَ :فَجِئْتُهُ بَعْدَ الْـعِشَـاءِ فَـدَخَـلْـتُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :سَـمِعْتُ رَسُـولَ الـلَّـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :أَتَـانِى جِبْرِيلُ، فَقَالَ :يَا مُـحَمَّدُ، إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ .قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ :فَـأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ :فَقَالَ :كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى

(মুসনাদে আহমদ, হা. ৭০৪)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

ইসলামের পরিপূর্ণতার দাবি :

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজই তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম, দ্বীন হিসেবে ইসলাম তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম। (মায়েদা ৩)

এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে, ইসলামের স্বতন্ত্র কোনো পোশাক আছে কি না। যদি আপনি বলেন নেই, তবে নাউজুবিল্লাহ! ইসলামের পরিপূর্ণ হওয়ার দাবিটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। অথচ এমন নয় বরং ইসলাম প্রত্যেক বিষয়ের জন্য মৌলিক বিধি-বিধান দান করেছে। মানবজীবনের কোনো স্তর ও বিষয় বাকি নেই, যা ইসলাম ব্যাখ্যা করেনি। কিন্তু মুসলমানগণ নিজেদের ইউনিফর্মের ব্যাপারে উদাসীন। অনেকে ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চলে, দায়িত্ব পালন করে; কিন্তু উর্দি তথা ইউনিফর্মের বেলায় উদাসীন হয়ে পড়ে। ড্রেস কোডের গুরুত্ব দিতে চায় না। এ ক্ষেত্রে অনেকে বলে থাকেন, আসল তো হলো অন্তর। অন্তর ঠিক থাকলে বাহ্যিক দিক যেরূপই হোক সমস্যা নেই। অথচ বিষয়টি এমন নয়। বরং এ ক্ষেত্রে এটি বড় একটি ভুল। বরং প্রত্যেকের জন্য জরুরি বিষয় হলো, অন্তর ঠিক রাখার পাশাপাশি বাহ্যিক দিককেও দুরস্ত করা। বাহ্যিক দিকগুলোও যেন শরীয়তসম্মত হয়।

পোশাকের শরয়ী মাপকাঠি :

পোশাকের সম্পর্ক মানুষের বাহ্যিক দিকের সাথে। তাও শরীয়তসম্মত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় এর কারণে সে ধর্তব্য হবে। এতদ্সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম পোশাকের যে নমুনা পেশ করেছে তার মধ্যে একটি হলো, উপর থেকে নিচের দিকে যে পোশাক পরা হয় যেমন, কুর্তা, পায়জামা, লুঙ্গি, কোবা, জুব্বা, পাঞ্জাবি ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য পরিমাপ হলো টাখনুর উপরে হতে হবে। টাখনু খোলা থাকতে হবে। যদি টাখনুর নিচে যায় তবে তার ওপর থেকে রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ইসবাল লুঙ্গি, কুর্তা, পাগড়ি সব কিছুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেউ যদি অহমিকাবশত এসব ঝোলায় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেবেন না। অর্থাৎ তার ওপর নারাজ হয়ে যাবেন। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪০৯৪)

শবেবরাতে যখন অসংখ্য মাখলুককে ক্ষমা করা হয় সে সময়ও যারা টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে তাদের মাগফিরাত করা হয় না, যতক্ষণ না সে তাওবা করে।

অথচ মুসলমান এটিকে খুব মামুলি বিষয়ই মনে করে থাকে। কেউ কেউ নামাযের সময় পায়জামা একটু ওপরে তুলে নেয়। টাখনু খুলে দেয়। অথচ শরীয়তের এই বিধান শুধু নামাযের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং সব সময়ের পোশাকের জন্যই নির্দেশিত। হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

যে অংশ টাখনুর নিচে লুঙ্গি দ্বারা ঢেকে থাকবে তা জাহান্নামে যাবে। (বোখারী শরীফ, হা. ৫৭৮৭)

অনেকে বলে থাকেন, আরবের জুব্বা লম্বা হয়ে থাকে। এত লম্বা হয় যে, তাতে টাখনু ঢেকে যায়। সে ব্যাপারে কথা হলো, তাদের আমল তো শরীয়তের দলিল নয়। বরং তা তাদের স্পষ্ট ভুল। যেমন কোনো আরব যদি নামায না পড়ে তা হবে তার ভুল। এটি সে রকমই। এখন কেউ যদি বলে ওই লোক আরবী হয়েও নামায পড়ে না তাহলে আমিও পড়ব না। এটি অত্যন্ত ভুল যুক্তি। তেমনি কোনো আরব যদি লম্বা জুব্বা পরিধান করে, তবে সেও হারাম কাজ করছে। শরীয়তের নাফরমানী করছে। বরং শরীয়ত যে মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাই পালনীয়। যদি এর বিপক্ষে করা হয় তবে শরীয়তের বিধান অমান্যকারী হিসেবেই বিবেচিত হবে। ফকীহগণও তা বলেছেন। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে,

ينبغى ان يكون الازار فوق الكعبين الى نصف الساق وهذا فى حق الرجال

প্রযোজ্য হলো পায়জামা ইত্যাদি টাখনুর ওপরে নিসফে সাক পর্যন্ত পরিধান করা। এবং এই বিধান পুরুষদের জন্য। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩৩৩)

সুতরাং এই বিষয়টিও মামুলি জিনিস নয়। বরং এর প্রতি খুবই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

আকাবীরদের ইহসান ভোলা যাবে না

মদ্যপের চারটি দু'আই কবুল হয়ে গেছে : জিগর মোরাদাবাদী (রহ.) হযরত থানভী (রহ.)-এর দরবারে পৌঁছে বলেন, হযরত আমি আপনার কাছে চারটি বিষয়ে দু'আ চাই।

১। আপনি দু'আ করবেন আমি যেন মদ পানের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি। ২। আমি যাতে হজ করতে পারি। ৩। আমি যেন দাড়ি রাখতে পারি। ৪। দুনিয়া থেকে যেন ঈমানের সাথে বিদায় নিতে পারি।

জিগর মোরাদাবাদী হযরত থানভী (রহ.)-এর দরবার থেকে প্রত্যাগমনের পর প্রথমেই মদপান সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন। তা পরিহার করার পরপরই তিনি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। যেহেতু তিনি সরকারি কবি ছিলেন, তাই ইংরেজ সরকার তাঁর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের বোর্ড বসাল। সব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বোর্ড রিপোর্ট দিল, জিগর মোরাদাবাদীর শরীরে কোনো প্রকার রোগ নেই। রোগ হলো তিনি দীর্ঘদিন মদপান করতেন। হঠাৎ এ অভ্যাস ত্যাগ করায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই রোগ দেখা দিয়েছে। তখন ডাক্তাররা বললেন, জিগর সাহেব, আপনি যদি বাঁচতে চান তবে সামান্য সামান্য মদ পান করতে হবে। হঠাৎ তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যায় না। হযরত জিগর মোরাদাবাদী (রহ.) বলেন, ডাক্তার সাহেব! আচ্ছা, আমি যদি মদপান করতেই থাকি তবে কয় বছর বাঁচব? উত্তরে বললেন, ৮-১০ বছর আরো বাঁচতে পারেন। এর উত্তরে হযরত জিগর মোরাদাবাদী (রহ.) বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করে দশ বছর বাঁচার চেয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করে দশ বছর আগে মৃত্যুবরণ করাকেই পছন্দ করি। এই বলে তিনি আর মদপান করলেন না বরং সম্পূর্ণরূপেই এই অভ্যাস ত্যাগ করলেন। এতে আল্লাহ তা'আলার রহমত হলো। তিনি কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে গেলেন। কালক্ষেপণ না করে ওই বছরই হজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সে সময় পানির জাহাজেই হজে আসা-যাওয়া করতে হতো। সময় লাগত প্রায় কয়েক মাস। এই সফরে তিনি দাড়িও রেখে দিলেন। দাড়িও লম্বা হয়ে গেল। সফরের কোনো এক ক্ষণে দর্পণে নিজের চেহারা দেখছিলেন। নিজের মুখে লম্বা দাড়ি দেখে তিনি একটি ছন্দ বললেন,

چلو دیکھ آئیں تماشہ جگر کا
سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے

চলো একটু দেখে আসি জিগরের অবস্থা, শুনেছি সে কাফের মুসলমান হয়ে গেছে। এখন জিগর মোরাদাবাদীও নিজের বন্ধু খাজা আজীজুল হাসান মজযুবের রূপে রূপায়িত হয়ে গেলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দু'আ তাঁর জন্য বাস্তব হয়ে দেখা দিল। তিনটি দু'আর মকবুলিয়্যাত জাহির হয়ে গেল। মদ ছাড়লেন, হজ আদায় করলেন এবং দাড়ি রেখে দিলেন। এখন চতুর্থ দু'আ হলো, ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করা। হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলেন, তাও নিশ্চয়ই কবুল হয়েছে। যখন চারটি দু'আর মধ্যে তিনটি বাস্তবে কবুল হতে দেখা গেল তাহলে চতুর্থটি কবুল হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি আস্থা রাখা যায়।

ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করা মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় সফলতা। যে লোক গোনাহমুক্ত জীবন যাপন করবে বা গোনাহমুক্ত জীবন অর্জন করবে সে নিশ্চয়ই ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে। আমরা প্রত্যেক জুমু'আর দিন আসরের পর গোনাহমুক্ত জীবন অর্জনের ফিকির নিয়েই এখানে একত্রিত হই। যাতে জানতে পারি কিভাবে জীবন যাপন করলে আমরা গোনাহমুক্ত জীবন যাপন করতে পারব। যদি গোনাহ হয়েই যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাওবা ইস্তিগফার করে গোনাহমুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে থাকি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোনাহমুক্ত হায়াত দান করুন। আমীন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর দৌহিত্র হও :

আজ মাদরাসাওয়ালাদের অনেকেই আসলাফদের আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে তৈরি হয়ে গেছে। অথচ তাদের যে এহসান আমাদের ওপর তা ভুলে যাওয়া যায় না। তাদের মাধ্যমে আমরা ইংরেজমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। তাঁদের মাধ্যমে আমরা কোরআন-হাদীসের ইলম পেয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে তাদের রূহানী আত্মীয় হয়ে থাকতে হবে। তাদের নীতি-আদর্শ ভুলে গেলে চলবে না। বরং প্রত্যেক বিষয়ে তাদের নীতি-আদর্শকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে। এখন আমাদের হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর রূহানী আত্মীয় বনতে ভালো লাগে না। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.), হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.), হযরত মুহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.), হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ও হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) প্রমুখের রূহানী সন্তান হিসেবে থাকতে

ভালো লাগে না। বরং আমরাও কিছু আধুনিকমনা ইসলামবিধ্বংসী লোকের বিভিন্ন দর্শন ও কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে তাদের নিসবত ও তাদের রূহানী সন্তান হওয়াকে পছন্দ করে বসি। তাদের কথাবার্তা ও যুক্তি দেখিয়ে আসলাফদের আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যেতে কোনো প্রকার দ্বিধান্বিতই হই না। খুবই আফসোস হয়, আমরা অনেকে নিজেদেরকে উলামায়ে দেওবন্দ বলে দাবি করি; কিন্তু আসলাফদের আদর্শ জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ময়দানে কারা ছিল?

আমি উলামায়ে দেওবন্দের কথা এই জন্য বলছি যে, এই উপমহাদেশে দ্বীন টিকে আছে উলামায়ে দেওবন্দের মাধ্যমে। যদি উলামায়ে দেওবন্দ না হতো তবে এই উপমহাদেশের এই দেশসমূহে যেরূপ দ্বীন সংরক্ষিত আছে, তা টিকে থাকা মুশকিলই ছিল।

আপনি একটু নজর ফিরিয়ে দেখেন, যখন ইহুদি-নাসারা, ইংরেজ বেনিয়ারা এই উপমহাদেশ করায়ত্ত করে তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন উলামায়ে দেওবন্দ। কোনো সরকারি মাদরাসার আলেম বা কোনো স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকগণ ঝাঁপিয়ে পড়েননি। ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহ.), কাসেম নানুতবী (রহ.), রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.), মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.), হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) প্রমুখ যুগের সেরা উলামায়ে কেরাম। তাঁরা শামেলীর ময়দানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। থানাভবনকে ইসলামী হুকুমত ঘোষণা করেছিলেন। এই স্বাধীনতা উলামায়ে দেওবন্দেরই অবদান।

এখানে যখন শামেলীর যুদ্ধ এবং আযাদী আন্দোলনের কথা এসে গেছে তখন উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করা উচিত মনে করলাম। হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর বর্ণনা অনুসারেই বলার চেষ্টা করব।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বর্ণনায় আযাদী আন্দোলন :

আমাদের সকল আকাবীর (দেওবন্দ, সাহারানপুর ও মুজাফফর নগরের উলামায়ে কেরাম) হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী (রহ.)-এর শাগরিদ ছিলেন। যার কারণে এমন হতে পারে না যে, তাঁরা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ও তাঁদের খান্দানের নীতি-আদর্শের বিপক্ষে চলবেন। ১৮২০ সালে যখন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী সাহেব (রহ.)-এর জিহাদ আরম্ভ হলো তখন হাজী আব্দুর রহীম শহীদে বেলায়াতী (রহ.) (যিনি ছিলেন হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহ.)-এর দাদা পীর) এবং হযরত শাহ নসীরুদ্দীন দেহলভী (রহ.) (যিনি ছিলেন হযরত মুহাজেরে মক্কী (রহ.)-এর সাবেক পীর ও মুরশিদ)সহ আরো বহু উলামায়ে কেরাম সাহারানপুর ও মুজাফফর নগরসহ বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং সীমান্ত এলাকায় গিয়ে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.)-এর সাথে ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হন। শুরুর দিকে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) বহু কামিয়াবী ও সফলতা অর্জন করেন। কিন্তু পরে নিজেদের কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতা এবং শিখদের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের ফলে সফলতার ধারা সামান্য গতি হারায়। সর্বশেষ ১৮৩১ ইংরেজিতে বালাকোট যুদ্ধে জনৈক মুসলমানের চক্রান্তের ফলে হযরত শাহ ইসমাঈল (রহ.) ও অন্য সহযোদ্ধাদের সাথে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.) শহীদ হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইংরেজবিরোধী এই আন্দোলন ১৮০৬ ইং সালে শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (রহ.)-এর নেতৃত্বে আরম্ভ হয়েছিল এবং ১৯৪৭ ইংরেজিতে উপমহাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

এই আন্দোলন জিহাদের রূপ গ্রহণ করে ১৮১৬ সালে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.)-এর নেতৃত্বে। এর পূর্বে ২০ বছর পরিবেশ ও জনমত সৃষ্টি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আয়োজনে ব্যয় হয়। ৬ বছর ধারাবাহিক জিহাদ জারি ছিল। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.), হযরত ইসমাইল শহীদ (রহ.)সহ বিশাল উলামায়ে কেরামের জামাআত শহীদ হওয়ায় বাকি মুজাহিদগণ নিজ নিজ এলাকায় চলে আসেন। তখনও মুজাহিদীনের একটি জামাআত ওই স্থানে অবস্থান করেন। নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা কুশেশ ব্যয় করতে থাকেন। তাঁদের ওপর পরাজয় প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং তাঁদের মাঝে কোনো প্রকার হতাশার চিহ্নও পরিস্ফুট হয়নি। তাঁরা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে জিহাদের জযবা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপ ছড়াতে থাকেন। এই আন্দোলন শুধুমাত্র উলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনদার মুসলমানগণ আরম্ভ করে ছিলেন। যার মাধ্যমে জনগণের মাঝে স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন উচ্ছ্বাস ও জযবা সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকার পরও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তা অবদমতি হয়নি। জিহাদের ফরজ আদায়ে প্রস্তুত হয়ে পড়েন ছোট- বড় সকল মুসলমান। পুরুষ-নারী, উঁচু-নিচু, সাধারণ এবং বিশিষ্ট তথা সর্বশ্রেণীর মানুষই নিজ নিজ সাধ্য-সামর্থ্য অনুয়ায়ী এই সংগ্রামে অংশ নেন। সকলে একই চিন্তাধারা ও একই নীতি-আদর্শের ওপর অবিচল থাকেন। অর্থাৎ এই ইংরেজ বেনিয়াদের পতন এবং তাদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করা। এই সংগ্রাম রুখে দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার জুলুম-অত্যাচারের এমন কোনো পন্থাই বাকি রাখেনি, যা তাদের দ্বারা সম্ভব

ছিল। মামলা-মোকদ্দমা, গুম-হত্যা, জুলুম-নির্যাতন–এককথায় মানবতা পরিপন্থী সর্বশেষ চেষ্টাতেও তারা ত্রুটি করেনি। তাদের নির্যাতন যতই বৃদ্ধি পেত, মুসলমানদের জিহাদের আকাঙ্ক্ষা যেন আরো বৃদ্ধি পেত। সর্বশেষ ১৮৫৭ সালে ইংরেজ সরকার সমস্ত মুজাহিদকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য সর্বশেষ চেষ্টাও চালিয়েছে। এক দিনেই হাজার হাজার মুজাহিদকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। এ দেশের মানুষকে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য ঢেলে দেওয়া হয়েছিল অর্থবন্যা। তারা পুরো হিন্দুস্তানি মুসলমান হোক বা হিন্দু অত্যন্ত নিচু দৃষ্টিতে দেখত। কথায় কথায় হেয়প্রতিপন্ন করত। অপমানসূচক শব্দ ব্যবহার করত। মোটকথা হলো, পুরো হিন্দুস্তানের জনগণের দৈনন্দিন জীবনে তাদের জুলুম-নির্যাতনে একপ্রকার দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। যার কারণে বাধ্য হয়েই সকলেই ইংরেজবিরোধী যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

বিশেষ করে, যে সকল মনীষী সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে ইংরেজবিরোধী যুদ্ধে শরীক ছিলেন, বালাকোটে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর শাহাদাতের পর ঘরে ফিরে এসেছিলেন তাদের অন্তর ইংরেজবিরোধী আন্দোলনকে চূড়ান্ত পথে নিয়ে যাওয়ার বিশাল স্পৃহা জাগ্রত ছিল। তাদের এই স্পৃহা নতুন করে আলোড়িত হয়। তারাই বিশেষভাবে এই সংগ্রামে অংশ নেওয়া নিজেদের জন্য ফরজ মনে করত।

এমতাবস্থায় উলামায়ে কেরাম ইংরেজবিরোধী জিহাদ ফরয হওয়ার ফাতাওয়া দিলেন। একটি ইজতিমা হলো। এর এজেন্ডা ছিল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনীর বিপরীতে আমাদের শক্তি কতটুকু আছে এবং এই ভিত্তিতে আক্রমণাত্মক জিহাদের শরয়ী ফয়সালা করা হয়।

জিহাদের জন্য মুসলমানদের কাছে কী পরিমাণ সমরাস্ত্র থাকা প্রয়োজন?

উলামায়ে কেরামের বৈঠকে উপস্থিত সকলে আক্রমণাত্মক জিহাদ করার সিদ্ধান্ত নেন। শুধু একজন বুযুর্গ ব্যক্তি শেখ মুহাম্মদ (রহ.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। শেখ মুহাম্মদ থানভী (রহ.) ছিলেন হযরত মিয়াজি নুর মুহাম্মদ জঞ্জানবী (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এবং হাফেজ জামেন সাহেব শহীদ (রহ.)-এর পীর ভাই। তাই তাঁদের মধ্যে খুবই সম্পর্ক ছিল। শেখ মুহাম্মদ সাহেব (রহ.) একজন নিয়মিত ও বড়মাপের আলেম ছিলেন। দিল্লির উলামায়ে কেরাম থেকে সমস্ত নেসাবী কিতাবের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হাফেজ জামেন শহীদ (রহ.) ও হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) পুরো নেসাব তাকমীল করেননি। যদিও রূহানী ইলমে সর্বোচ্চ শিখরে ছিলেন। এ কারণে শরয়ী মাসআলার ক্ষেত্রে উভয়ই হযরত শেখ মুহাম্মদ (রহ.)-এর অনুসরণ করতেন। শেখ মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুসলমানদের জন্য ফরয নয়। বরং জায়েযও মনে করতেন না তিনি। এই মতদ্বৈতার কারণে সঠিক ফাতাওয়া জানার জন্য হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গুঙ্গুহী (রহ.) ও হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-কে ডাকা হলো। তাঁরা উভয়ই বৈঠকে শরীক হয়ে উক্ত বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

এই বৈঠকের আলোচনা প্রায় এভাবেই ছিল :

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) নিজের চাচা পীর হযরত শেখ মুহাম্মদ (রহ.)-কে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আপনি এই দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয তো দূরের কথা জায়েযই মনে করেন না কেন? হযরত শেখ মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, কারণ আমাদের কাছে সমরাস্ত্র নেই, বরং একেবারেই আমরা খালি হাত।

হযরত নানুতবী (রহ.) বলেন, এটুকু সামানও কি আমাদের কাছে নেই, যা বদর যুদ্ধে ছিল?

হযরত শেখ মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, আপনার যাবতীয় দলিল আমি যদিও মেনে নিই তবে জিহাদের জন্য একটি বড় শর্ত হলো ইমাম নিযুক্ত হওয়া। এমতাবস্থায় নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ইমাম কে আছে?

হযরত নানুতবী (রহ.) বলেন, ইমাম নিযুক্ত করা তো সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমরা সকলে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করব। তখন হযরত জামেন (রহ.) বলেন, মাওলানা! ব্যস! আমাদের বুঝে এসে গেছে, চলুন আমরা সবাই হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কীর হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করলাম। এভাবে জিহাদের তৈরি আরম্ভ হয়ে গেল। ঘোষণা করা হলো, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে আমীর নিযুক্ত করা হলো, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী থাকবেন সেনাপ্রধান, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) হবেন বিচারক এবং মাওলানা মনীর সাহেব ও মাওলানা হাফেজ জামেন সাহেব মন্ত্রণালয় পরিচালনা করবেন।

যেহেতু এসব যুগ শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম মুসলমানদের মাঝে লিল্লাহিয়্যাত, ইখলাস এবং ইলমের বিষয়ে জনগণের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ছিল, সে কারণে খুব কম সময়ের নোটিশে ছোট-বড় সমাবেশ হতে থাকে। ওই সময় পর্যন্ত অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তাই প্রায় সকলের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। যাদের প্রয়োজন হতো তাদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া হতো। তবে যে অস্ত্রগুলো তাদের কাছে ছিল তা ছিল প্রাচীন মডেলের। কার্তুস আর রাইফেল ইত্যাদি ছিল না। এসব আধুনিক অস্ত্র শুধু ইংরেজ বাহিনীর হাতেই ছিল। এমন পরিস্থিতিতে কয়েক হাজার মুজাহিদ একত্রিত হয়ে থানাভবন

এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামী হুকুমত ঘোষণা করলেন। সেখানে অবস্থানরত ইংরেজদের সকল সরকারি কর্মকর্তাকে বিতাড়িত করা হলো।

শামেলীর যুদ্ধ :

এরপর মুসলমানগণ জানতে পারল, সাহারানপুর থেকে বিশাল সেনাদল কামানসহ সমরাস্ত্র নিয়ে শামেলীর দিকে রাতেই রওনা দেবে। তাতে মুসলমানদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হলো। কারণ মুসলমানদের হাতে থাকা অস্ত্রের মধ্যে আছে শুধু তলোয়ার, বন্দুক, পর্চা ইত্যাদি। এমন কোনো অস্ত্র নেই, যার মাধ্যমে কামান ইত্যাদি ভারী অস্ত্রের মোকাবেলা করতে পারবে। তখন হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। যে রাস্তা দিয়ে ইংরেজ সেনাদের আগমন হবে তার পাশে একটি বাগান ছিল। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহ.) ৩০-৪০ জনের একটি মুজাহিদ বাহিনী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর নেতৃত্বে তৈরি করলেন। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) পরিচালনাধীন মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়ে ওই বাগানে অবস্থান করলেন। মুজাহিদদের হেদায়াত করলেন যে, সকলে প্রস্তুত থাকবে। আমি যখন নির্দেশ দেব একসাথে হামলে পড়তে হবে। যখন ইংরেজ সেনাদল বাগানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করল সকলে একসাথে ফায়ার আরম্ভ করে দিলেন।

ইংরেজ সেনারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল, এই বাগানে কত মুজাহিদ আছে তা সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। তারা কামান ইত্যাদি ছেড়ে পালিয়ে গেল। হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) তাদের এই বিশাল সমরাস্ত্রগুলো মসজিদের সামনে স্থাপন করলেন। এতে করে উলামায়ে কেরামের দূরদর্শিতা এবং যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করল।

শামেলী সে যুগের একটি কেন্দ্রীয় এলাকা। সাহারানপুরের কাছাকাছি। সেখানে ইংরেজদের একটি ঘাঁটি ছিল। উলামায়ে কেরামের পরামর্শে সিদ্ধান্ত হলো সেখানে হামলা করার। সিদ্ধান্ত মতে সেখানে মুজাহিদগণ হামলা করলেন এবং খুব দ্রুত তা করায়ত্ত করে নিলেন। এই হামলার মধ্যে হযরত জামেন (রহ.) শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শাহাদাতের পর অবস্থা কিছুটা ব্যতিক্রম হয়ে উঠল। তাঁর শাহাদাতের পূর্বে বিভিন্ন স্থান থেকে খবর আসত আজ ওই অঞ্চল থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা হয়েছে। ওই অঞ্চল মুসলমানদের করায়ত্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর শাহাদাতের পর খবর আসতে থাকল দিল্লি পুনরায় ইংরেজরা দখল করে নিয়েছে। ওই অঞ্চল মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) লেখেন, এমন মনে হলো, তাঁর শাহাদাতের পর মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং সকলে সাহস হারিয়ে ফেলেছে। জনগণের এহেন নৈরাশ্যকর অবস্থা দেখে নেতৃবৃন্দও নিজ নিজ এলাকায় চলে এলেন।

১৮৫৭ সালের এই সংগ্রামের প্রায় ১৬ বছর পূর্বে হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রহ.) হিন্দুস্তানের ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র মক্কা শরীফে স্থানান্তর করেন এবং দিল্লিতে একটি প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়েছিলেন, যার নেতৃত্ব ছিল মাওলানা মমলুক আলী (রহ.)-এর হাতে। অতঃপর সে নেতৃত্ব আসে হযরত মাওলানা এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) হাতে। সে হিসেবে ১৮৫৭ তে থানাভবন এলাকায় সংঘটিত সংগ্রামের প্রধান ছিলেন হযরত মাওলানা এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)।

১৮৫৭-এর সংগ্রামে পরাজয়ের পর হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) অত্যন্ত ভয়ার্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মক্কা শরীফের দিকে রওনা দেন। মক্কা শরীফে বসে তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। হযরত মাওলানা আব্দুল গণী মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.), যিনি দিল্লিতে দরসের মসনদে হযরত হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (রহ.)-এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন এবং সে সময়ের যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী (রহ.) ও মক্কা শরীফে অবস্থান করে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে মহান অবদান রেখেছেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের সূচনা :

ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের বড় বড় সিপাহসালার হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহ.), হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুনীর সাহেব (রহ.), হযরত মাওলানা মাজহার সাহেব প্রমুখকে ভারতেই রাখা হয়। ইংরেজবিরোধী এই শামেলী যুদ্ধে শহীদানের রক্ত শুকানোর পূর্বেই এই বুযুর্গগণ ১৮৬৬ ইং মোতাবেক ১২৮৩ হি.তে ১৮৫৭ সালের মাত্র ৮ বছরের মাথায় মাদরে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি রাখেন। পর পর জামিয়া কাসেমিয়া শাহি মোরাদাবাদ এবং মজাহেরে উলূম সাহারানপুর মাদরাসারও ভিত্তি রাখা হয়। রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে সম্পূর্ণ ইসলামী শিক্ষানির্ভর এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তি রাখা হলেও যুগ শ্রেষ্ঠ এসব উলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ রাষ্ট্র বাঁচানোর এই সংগ্রাম এবং আযাদী আন্দোলনকে নিজেদের দায়িত্ব ও ফরজ মনে করতেন।

সে অনুভূতির কারণেই যখন ১৮৮৫ ইং সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন এই দলের নেতা শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.) এবং তাঁর সহকর্মীগণ কংগ্রেসে অংশ নেওয়ার ফাতাওয়া দেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের হাতের খেলনার পুতুল ব্যক্তিবর্গ ও খান বাহাদুরদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত তীর নিজেদের বুকে ধারণ করে নেন।

(ফুয়ূজে রহমানী অবলম্বনে)

সীরাতে রাসূল (সা.)-এর আলোকে জুমু'আর দিনের আমল

শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.

জুমু'আর দিনের শ্রেষ্ঠত্ব

হাদীস : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিন সর্বোত্তম। এই দিন হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁকে বেহেশতে দাখেল করা হয়েছে এবং এই দিন তাঁকে বেহেশত থেকে বের করে (পৃথিবীতে পাঠিয়ে) দেওয়া হয়েছে এবং জুমু'আর দিনই কিয়ামত কায়েম হবে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫৪)

জুমু'আর দিন গোসল করা

হাদীস : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে যায় সে যেন গোসল করে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৭৭, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৪৪)

জুমু'আর দিন সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা

হাদীস : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমু'আর দিন যেন প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি গোসল করে, মিসওয়াক করে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৮৮, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৪৬)

জুমু'আর নামাযের ফযীলত

হাদীস : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমু'আর দিন এলে মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশতাগণ বসে যান। তাঁরা একের পর এক আগমনকারীর নাম লিপিবদ্ধ করেন। যখন ইমাম (মিম্বরে) বসে পড়েন তখন তাঁরা নথিপত্র গুটিয়ে আলোচনা শোনার জন্য চলে আসেন। মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী ব্যক্তি উট দানকারীর সমতুল্য, তারপর আগমনকারী ব্যক্তি গরু দানকারীর সমতুল্য, তার পরের জন মেষ দানকারীর সমতুল্য, এর পরের জন মুরগি দানকারীর সমতুল্য এবং তারও পরে আগমনকারী ব্যক্তি ডিম দানকারীর সমতুল্য (সাওয়াব লাভ করেন)। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫০)

হাদীস : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ফরয গোসলের মতো ভালোভাবে গোসল করল এবং নামাযের জন্য আগমন করল, সে যেন একটি উট সদকা করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করল, সে যেন একটি গাভি সদকা করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করল, সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা সদকা করল। যে চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল, সে যেন একটি মুরগি সদকা করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল, সে যেন একটি ডিম সদকা করল। এরপর যখন ইমাম খুতবা প্রদানের জন্য বের হন, তখন ফেরেশতাগণ খুতবা শোনার জন্য হাজির হয়ে যান। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৮১)

হাদীস : হযরত আলী (রা.) একটি লম্বা হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইমাম খুতবা দেওয়া শুরু করলে যে ব্যক্তি চুপচাপ বসে শোনে সে দুটি বিনিময়প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এত দূরে বসে যে, ইমামের খুতবা শুনতে পায় না, তবুও চুপ থাকে এবং অনর্থক কথা বা কাজ না করে, সে একটি বিনিময়প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এমন স্থানে বসে যেখান থেকে ইচ্ছা করলে ইমামের খুতবা শুনতে এবং তাঁকে দেখতে পায়, তবুও অনর্থক কথা বা কাজ করে এবং চুপ না থাকে, সে গুনাহগার হয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনই বলতে শুনেছি। (সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ১০৫১)

জুমু'আর দিনে ছয়টি আমলের বিশেষ ফযীলত

হাদীস : হযরত আউস ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের উদ্দেশ্যে ভালোভাবে গোসল করবে, ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে (আযানের অপেক্ষা না করে) মসজিদে যাবে, পায়ে হেঁটে যাবে, বাহনে আরোহণ করবে না, ইমামের

কাছাকাছি বসবে, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনবে, (খুতবা চলাকালীন) কোনো কথা বলবে না বা কাজ করবে না, সে জুমু'আর নামাযে (যাওয়া-আসার) পথে প্রতি কদমে এক বছরের নফল রোযা ও এক বছরের নফল নামাযের সাওয়াব পাবে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা; হাদীস ১৭৫৮, জামে' তিরমিযী; হাদীস ৪৯৬, সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ৩৪৫, সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৩৮৪)

জুমু'আর নামাযে গোনাহ মাফ হয়

হাদীস : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি গোসল করে জুমু'আর নামাযে এলো, তাওফিক অনুযায়ী নামায আদায় করল, ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকল, এরপর ইমাম সাহেবের সাথে জুমু'আর নামায আদায় করল, তার দুই জুমু'আর মধ্যবর্তী দিনসমূহ এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫৭)

হাদীস : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ এবং এক রমাযান থেকে অন্য রমাযানের মধ্যকার সমস্ত গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৩৩)

জুমু'আর নামায ত্যাগকারীর প্রতি সতর্কবাণী

হাদীস : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মিম্বরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, মানুষ যেন জুমু'আর নামায ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেবেন, এরপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৬৫)

জুম'আর নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে কাউকে উঠিয়ে তার জায়গায় বসবে না

হাদীস : হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কেউ যেন তার ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে। ইবনে জুরাইজ (রহ.) বলেন, আমি নাফে' (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি শুধু জুমু'আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুমু'আ ও অন্যান্য নামাযের ব্যাপারেও। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৯১১)

হাদীস : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমু'আর দিন তোমাদের কেউ যেন তার ভাইকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে। বরং এটা বলতে পারে, জায়গা করে দাও। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১৭৮)

জুমু'আর দিন মসজিদে লোকজনের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাবে না

হাদীস : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, জুম'আর দিন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। সে লোকজনের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যেতে লাগল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বসে যাও। তুমি দেরি করে এসে লোকদের কষ্ট দিচ্ছ। (সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ১১১৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১১১৫)

খুতবার সময় ইমামের কাছাকাছি বসা

হাদীস : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যিকরের জায়গায় (জুম'আর মসজিদ) হাজির হও এবং ইমামের কাছাকাছি বসো। কেননা যে দূরে দূরে থাকবে, সে জান্নাতী হলেও তার জান্নাতে প্রবেশ বিলম্বিত হবে। (সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ১১০৮)

জুমু'আর দিন খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা

হাদীস : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইমামের খুতবা চলাকালে তুমি যদি তোমার সাথীকে বলো, 'চুপ করো', তবে তুমি একটি অনর্থক কাজ করলে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৯৩৪, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫১)

হাদীস : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা ইমাম বের হয়ে আসার পর অর্থাৎ মিম্বরে বসার পর কথা বলা ও নামায পড়াকে মাকরূহ বলতেন। (ত্বহাবী : ১/২৫৩, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক; হাদীস ৫১৭৫)

জুমু'আর আগে চার রাক'আত সুন্নাত ও পরে চার রাক'আত সুন্নাত

হাদীস : হযরত আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) আমাদেরকে জুমু'আর পূর্বে চার রাক'আত ও পরে চার রাক'আত নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন। (মুসান্নাফে

আব্দুর রাযযাক; হাদীস ৫৫২৫)

হাদীস : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর নামায পড়ে সে যেন জুমু'আর ফরযের পর চার রাক'আত নামায পড়ে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৮১

জুমু'আর পরে চার রাক'আত সুন্নাত পড়ে আরো দুই রাক'আত পড়া উচিত

হাদীস : হযরত আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যখন আমাদের মাঝে (হুকুমতের পক্ষ থেকে) এলেন, তখন তিনি জুমু'আর পরে চার রাক'আত পড়তেন। এরপর হযরত আলী (রা.) তাঁর খেলাফতকালে এসে জুমু'আর পরে দুই রাক'আত ও চার রাক'আত (মোট ছয় রাক'আত) পড়তে লাগলেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) এটা আমাদের কাছে ভালো লাগল। ফলে আমরা এটা গ্রহণ করলাম। (ত্বহাবী; হাদীস ১৯৮০)

হাদীস : হযরত আলী (রা.) থেকে অপর রেওয়াতে আছে, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা জুমু'আর নামায পড়বে তারা যেন ছয় রাক'আত পড়ে। (ত্বহাবী; হাদীস ১৯৭৮)

জুমু'আর দিন দু'আ কবুলের সময় কোনটি?

হাদীস : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তাতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, তখন কোনো মুসলমান বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি নিজ হাত মুবারক দিয়ে ইশারা করলেন, সেই সময়টি অল্প। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৯৩৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫২)

মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় আছে, সেই সময়টি হচ্ছে ইমামের (মিম্বরে) বসা থেকে নামায শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময়। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫৩)

তিরমিযীর একটি বর্ণনায় আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমু'আর দিনের যে সময়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ কবুলের আশা করা যায়। সে সময়টিকে তোমরা আসরের পর থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত তালাশ করো। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, জুমু'আর দিন কাঙ্ক্ষিত দু'আ কবুলের সময় আসরের পর এবং সূর্য হেলে যাওয়ার পর। (জামে' তিরমিযী; হাদীস ৪৮৯)

জুমু'আর দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করা

হাদীস : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করবে, দুই জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ে তাকে একটি আলোকিত নূর দেওয়া হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৩৩৯২)

হাদীস : হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাযত করবেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮০৯)

জুমু'আর দিন বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়া

হাদীস : হযরত আউস ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিন সর্বোত্তম। এই দিনে হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁর ওফাত হয়, এই দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, এই দিন সব সৃষ্টি জীব বেহুঁশ হয়ে যাবে। কাজেই এই দিনে তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়ে থাকে। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের দরূদ আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে, যখন আপনার দেহ মাটিতে মিশে যাবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহগুলোকে মাটির জন্য (বিনষ্ট করা) হারাম করে দিয়েছেন। (সুনানে আবী দাউদ; হাদীস ১০৪৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১০৮৫, সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৩৭৪)

জুমু'আর দিনের বিশেষ একটি দরূদ শরীফ রয়েছে। আসরের নামাযের পর নিজ স্থানে বসে দরূদ শরীফটি আশি বার পাঠ করা উচিত। যার ফযীলত এই যে, আমলকারীর আমলনামায় আশি বছরের ইবাদত-বন্দেগীর সাওয়াব লেখা হয় এবং আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (আল কুরবাতু ইলা রব্বিল আলামীন বিস সলাতি আলান নাবিয়্যী সায়্যিদিল মুরসালীন, ইবনে বাশকুওয়াল; হাদীস ১০৬, ১১১)

দরূদটি হচ্ছে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে
‘খতমে নবুওয়াত’ আকীদা-৯

শারেহুল হাদীস আল্লামা রফীক আহমদ

পবিত্র হাদীসের আলোকে খতমে নবুওয়াত ৪ :

৩১। কিয়ামত ও শাফায়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে,

فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ :اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَنَا فَيَقُولُ :إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، إِنِّي اتُّخِذْتُ وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ مَتَاعًا فِي وِعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ، أَكَانَ يُوصَلُ إِلَى مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ؟، فَيَقُولُونَ :لَا فَيَقُولُ :فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": فَيَأْتِينِي النَّاسُ فَيَقُولُونَ :اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَنَا فَأَقُولُ :أَنَا لَهَا، أَنَا لَهَا، حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ خَلْقِهِ نَادَى مُنَادٍ :أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّتُهُ؟ فَأَقُومُ وَيَتْبَعُنِي أُمَّتِي، غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الطُّهُورِ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ، أَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، وَتُفْرِجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا، وَتَقُولُ الْأُمَمُ :كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلَّهَا

কিয়ামতের দিন সর্বশেষ সকল মানুষ হযরত ঈসা (আ.)-এর সান্নিধ্যে গিয়ে বলবে, হে রুহুল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন, যাতে আমাদের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হয়ে যায়। হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, আমি এ কাজ করতে পারব না। কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ ব্যতীত আমার এবং আমার মায়ের উপাসনা করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা কি জানো না, যদি কোনো পাত্র বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয় তবে সে মোহর খোলা ছাড়া ওই পাত্র কি খোলা যায়? লোকেরা বলবে, এমন তো হতে পারে না। হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, মুহাম্মদ (সা.) (যিনি নবী-রাসূলের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মোহরস্বরূপ) মওজুদ আছে। তাঁর আগে-পরের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। (তোমরা তাঁর কাছে যাও) রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, এই কথা শুনে লোকেরা আমার নিকট আসবে এবং বলবে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। যাতে আমাদের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হ্যাঁ, এই কাজ আমিই করব। (রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুপারিশের পর) আল্লাহ যাকে চান অনুমতি দেবেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ফায়সালা করার ইচ্ছা করবেন তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবেন, আহমদ এবং তাঁর উম্মত কোথায়? আমি রওনা হব আমার উম্মত আমার অনুসরণ করবে। তাদের ওজুর অঙ্গগুলো প্রজ্বলিত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমরাই সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম, এবং ওই যাদের হিসাব সর্বপ্রথম হবে। সমস্ত উম্মত আমাদের জন্য সম্মানার্থে রাস্তা ছেড়ে দেবে। সকল উম্মত বলবে, এই উম্মত তো নবীগের মধ্যে গণ্য হওয়ার সন্নিকটে। (মুসনাদে আহমদ, হা. ২৫৪৬, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালেসী, হা.২৮৩৪, মুসনাদে আবু ইয়ালা, হা. ২৩২৮)

৩২।

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخِي زِيَادٍ لِأُمِّهِ قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرَةَ :أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ,ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ ثَانِيًا عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ,ثُمَّ قَالَ " :أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ شَأْنَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي شَأْنِهِ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَّالِ

হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, মুসাইলামাতুল কাযযাব সম্পর্কে রাসূল (সা.) তখন পর্যন্ত কিছু বলেননি কিন্তু আমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন কথা প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা খুতবা দিচ্ছিলেন এবং হামদ ছানার পর ইরশাদ করেন, ওই লোক যার সম্পর্কে তোমরা কথোপকথন করছ সেই তো ওই ত্রিশ মিথ্যুকদের একজন, যারা দাজ্জালের আগে প্রকাশ পাবে। (মুসনাদে আহমদ, হা. ২০৪২৮, সহীহে ইবনে হিব্বান, হা. ৬৬৫২)

৩৩।

عَنْ قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

وَمِنْ نُوحٍ) (الأحزاب :٧) ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِى الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ وفى رواية ابى هريرةؓ مثله۔

হযরত কাতাদা (রা) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আমি সৃষ্টির দিক দিয়ে সর্বপ্রথম আর প্রেরিত হয়েছি সর্বশেষে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায়ও অনুরূপ রয়েছে। (তাফসীরে দুররুল মনসূর ৫/৮৪)

৩৪।

عَن عَائِشَةَ قَالَت :قَالَ رَسُول الله صلى اللـه عَلَيْهِ وَسلم :أَنا خَاتم الْأَنْبِيَاء ومسجدى خَاتم مَسَاجِد الْأَنْبِيَاء

হযরত আয়েশা (রা.)এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার মসজিদই নবীদের মসজিদের সর্বশেষ মসজিদ। (তাফসীরে দুররে মনসুর ২/৩৬৯, যাওয়ায়েদ, হা. ১১৯৩)

৩৫।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :لَمْ يَبْقَ بَعْدِى مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ

হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার পর মুবাশশারাতের মধ্যে উত্তম স্বপ্ন ছাড়া কিছুই বিদ্যমান থাকেনি। (অর্থাৎ ওহীর ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে) (শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী], হা. ৪৪১৯)

৩৬।

تَنَاسَخَتِ النُّبُوَّةُ فَصَارَتْ مُلْكًا، رَحِمَ اللهُ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَخَرَجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلَهَا

হযরত মুআয (রা.) ফিতনা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, নবুওয়াতের ধারা শেষ হয়ে গেছে। এখন মুলকে আদুদ তথা ক্ষতিকর বাদশাহীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার ওপর রহম করুন, যারা এই ক্ষমতাকে বৈধভাবে গ্রহণ করে এবং তা থেকে এমন পাক-পবিত্র অবস্থায় বের হয়, যেভাবে সে প্রবেশ করেছে। (আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী], হা. ২৮৬১)

৩৭।

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :-نُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً، نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আমরা ৭০ উম্মত পূর্ণ করব। তার মধ্যে আমরা সর্বশেষ এবং সর্বোত্তম উম্মত হব। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হা. ৪২৮৬)

৩৮।

عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :إِنَّ اللَّهَ أَدْرَكَ بِىَ الْأَجَلَ الْمَرْحُومَ وَاخْتَصَرَ لِىَ اخْتِصَارًا فَنَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হযরত উমর ইবনে কায়স (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমাকে একটি প্রতীক্ষিত কাজের জন্য বেঁচে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা সর্বশেষ এবং কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে। (সুনাদে দারামী, হা. ৫৫)

৩৯।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى أَحَدٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِى بَكْرٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِىٌّ.

হযরত আবু দরদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, নবীদের পরে সমস্ত মানুষের মধ্যে হযরত আবু বকরই (রা.) শ্রেষ্ঠ। (ফাজায়ে সাহাবা [ইমাম আহমদ রহ.], হা. ৫০৮)

৪০।

হযরত উমর (রা.) হতে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى أَحَدٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِى بَكْرٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِىٌّ.

জনৈক গ্রাম্য লোককে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন সে লোক একটি গুইসাপ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুখে রাখলো এবং বলল, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনব না যতক্ষণ এই গুইসাপ আপনার প্রতি ঈমান না আনে। রাসূলুল্লাহ (সা.) গুইসাপকে সম্বোধন করে বললেন, বলো তো আমি কে? এই গুইসাপ অত্যন্ত সাবলীল আরবী ভাষায়–যা উপস্থিত সকলে বুঝছিলেন–বলল, লাব্বাইক ওয়া সাদাইক ইয়া রাসূলা রাব্বুল আলামীন, অর্থাৎ হে পালনকর্তার সাচ্চা রাসূল! আমি উপস্থিত, আপনার অনুসরণ করে থাকি, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কার ইবাদত করো? উত্তরে বলল, আমি ওই সত্তার ইবাদত করি, যিনি আসমানে আরশে আজীম রয়েছেন এবং পুরো পৃথিবী যার মুঠোই এবং সারা বিশ্বে যার রাজত্ব এবং সাগরে যার বানানো রাস্তা রয়েছে, জান্নাতে যার রহমত এবং জাহান্নামে যার আযাব আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি কে? উত্তরে বলল, আপনি আল্লাহর সাচ্চা রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। (আলমুজামুস সাগীর

[তাবারানী], হা. ৯৪৮)

এ পর্যন্ত আমরা খতমে নবুওয়াতের ওপর ৪০টি হাদীস বর্ণনা করলাম। যা খতমে নবুওয়াতের দলিল হিসেবে খুবই স্পষ্ট। উলামায়ে কেরাম তাদের কিতাবে আরো অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন।

পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোনো প্রকার নবী-রাসূল আগমনের কোনোই সম্ভাবনা নেই এই আকীদাটি ইসলামের মৌলিক আকীদা। যা অস্বীকার তো দূরের কথা এই আকীদার ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ পোষণ করাও কুফরী।

কাদিয়ানী এই আকীদাকে শুধু অস্বীকারই করেছে তা নয় বরং ইসলামের এই মৌলিক আকীদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং এই আকীদা সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির জন্য বিভিন্নভাবে অপপ্রয়াস চালিয়েছে। স্বয়ং পবিত্র কোরআন ও হাদীসের মিথ্যা ও বানোয়াট অপব্যাখ্যা করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। যার কিছু কিছু আমরা উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের অধীনে আলোচনা করেছি। কাদিয়ানীদের এই অপতৎপরতা এই কথারই প্রমাণ যে, তারা শুধু নিজেরা এই আকীদার অবিশ্বাসী নয় বরং মুসলমানদের এই আকীদাবিরোধী বানানোর জন্যই তাদের যাবতীয় আয়োজন। এসব কারণে যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরাম কাদিয়ানীদেরকে শুধু কাফিরই বলেননি বরং তাদের এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য যাবতীয় চেষ্টা-প্রয়াস চলিয়ে গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এই খিদমাত কবুল করুন। আমীন।

গোলাম কাদিয়ানী ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে ফাঁদ পেতে ছিল তা অতীব ভয়ঙ্কর। সে শুরু থেকে নিজের ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি করে তা প্রচার করে। এক কিতাবে সে নিজেকে মুজাদ্দিদ দাবি করলে অন্য কিতাবে দাবি করেছে সে মুহাদ্দাস। একটাতে নিজেকে ইমাম মাহাদী দাবি করলে অন্যটাতে নিজেকে মসীলে মসীহ বা আইনে মসীহ দাবি করে। একটাতে নিজেকে সরাসরি নবী দাবি করলে অন্যটাতে জিল্লি নবী ও বুরুজী নবী দাবি করে। একটাতে নিজেকে তাশরীয়ী নবী দাবি করলে অন্যটাতে স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.) দাবি করে। নাউজুবিল্লাহ।

কাদিয়ানীদের বিভিন্ন দাবি :

১। মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি :

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার কিতাবুল বারিয়্যাতে লেখে–

جب تیرھویں صدی کا اخیر ہوا اور چودھویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالی نے الہام کے ذریعہ سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے

যখন তেরো শতাব্দী শেষ হলো এবং চৌদ্দতম শতাব্দী আরম্ভ হলো তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এলহামের মাধ্যমে বলেন যে, তুমি এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। (কিতাবুল বারিয়্যা ১৬৮)

আরো বিভিন্ন কিতাব ও লিটারেচারে এই দাবির কথা পাওয়া যায়।

২। মুহাদ্দাস হওয়ার দাবি :

কাদিয়ানী তার কিতাব তাওজীহুল মারামে লেখে :

ماسوا اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالی کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی میں نبی ہی ہوتا ہے

এছাড়া এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই অধম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের জন্য মুহাদ্দাস হিসেবে আগমন করেছে আর মুহাদ্দাসও এক প্রকার নবী হয়ে থাকে। (তাওজীহুল মারাম ১৮, রূহানী খাযায়েন ৩/৬০)

কাদিয়ানীর এই দাবির জবাবে উম্মতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর কেউ মুহাদ্দাস হতে পারে কি না, সে সম্পর্কে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে।

৩। ইমাম মাহদী হওয়ার দাবি :

وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی مائدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الٰہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے تیرہ سو سال پہلے رسول کریم ﷺ نے دی تھی وہ میں ہی ہوں۔

ওই সর্বশেষ মাহদী যিনি ইসলামের অধঃপতন ও গোমরাহীর বিস্তৃতি লাভের সময় সরাসরি আল্লাহর হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে আসমানী নিয়ামতকে নতুন করে মানুষের মধ্যে বিতরণকারী হিসেবে তাকদীরে লেখা আছে, আজ থেকে তেরোশত বছর পূর্বে যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সে (ইমাম মাহদী) আমিই। (তাযকারাতুশ শাহাদাতাইন ২)

৪। অপরূপ মসীহে মওউদ হওয়ার দাবি :

اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعوی کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں یہ کوئی نیا دعوی نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالی سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر بہ تصریح درج کر دیا تھا۔

এই অধম মসীহে মওউদের অপরূপ হওয়ার যে দাবি করল, যাকে অনেক অজ্ঞলোক স্বয়ং মসীহে মওউদ মনে

করেছে তা কোনো নতুন দাবি নয়, যা আজই আমার মুখ থেকে নিসৃত হয়েছে। বরং এটি সেই পুরাতন ইলহাম, যা আল্লাহ তা'আলা থেকে পেয়ে আমি 'বরাহীনে আহমদিয়া' নামক কিতাবে বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। (এযালায়ে আওহাম ১৯০)

৫। সরাসরি মসীহে মওউদ হওয়ার দাবি :

مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعوے مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔

যখন সময় এলো তখন আমাকে ওই গোপন রাজের কথা বোঝানো হয়েছে, তখন থেকে আমি বুঝতে পারলাম আমার মসীহে মওউদ হওয়ার দাবি কোনো নতুন কথা নয়। (কিশতিয়ে নুহ ৪৭, রুহানী খাজায়েন ১৯/৫১)

৬। সরাসরি নবী ও রাসূল হওয়ার দাবি :

میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی

আমি রাসূলও এবং নবীও। অর্থাৎ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিতও আবার আল্লাহ গায়েবী খবরপ্রাপ্তও। (রূহানী খাজায়েন ১৮/২১১)

اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔

এবং আল্লাহ তা'আলার কসম করে বলছি যার হাতে আমার জান যে, তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তিনিই আমাকে নবী নাম রেখেছেন, তিনিই আমাকে মসীহে মওউদের নামে ডেকেছেন। তিনি আমার সত্যায়নের জন্য বড় বড় আলামত প্রকাশ করেছেন, যা সংখ্যায় তিন লাখেরও বেশি। (তাতিম্মায়ে হাকীকতে ওহী ৬৮, রূহানী খাজায়েন ২২/৫০৩)

মোটকথা হলো, গোলাম কাদিয়ানী ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কিতাবে কাদিয়ানীর হাজারো দাবি পাওয়া যায়। যা পড়তে গেলেও মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তার প্রত্যেকটা দাবিতেই ইসলাম এবং মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস নষ্ট করার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত রয়েছে।

পবিত্র কোরআনের আয়াতকে তার ইলহাম দাবি :

কত বড় দুঃসাহস এই গোলাম কাদিয়ানীর সে নিজেকে নবী দাবি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ইলহামের কথা বলে থাকে, তার প্রায়ই হলো পবিত্র কোরআনে রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে যেসব আয়াত নাযিল করেছেন সেগুলোই। সে তার কিতাবাদীতে তার নবী হওয়ার দলিল হিসেবে পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোকেই তার প্রতি ইলহাম করা হয়েছে বলে দাবি করেছে। (নাউজুবিল্লাহ) (এসব বিষয় তার কিতাব হাকীকাতুল ওয়াহী ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে।)

কাদিয়ানীরা তার বিভিন্ন দাবিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কৌশল বাস্তবায়ন করে। যেখানে যে দাবি খাটানো যায় সেখানে তাই করে। নবী হওয়ার দাবি যখন উলামায়ে কেরামের দালিলিক বিপ্লবের সামনে ধোপে টেকে না তখন তারা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মসীহে মওউদ হিসেবে উপস্থাপন করে। তাও যখন টেকে না তখন তারা ইমাম মাহদীর দাবিটিকে সামনে নিয়ে আসে। আবার ইমাম মাহদী ও মসীহে মওউদকে এক ব্যক্তি বলেও দাবি করে। এরূপ অসংখ্য কুফরী, ভ্রান্ত মিথ্যা-বানোয়াট দাবি ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে পুরো মুসলিম দুনিয়াকে তারা প্রতারণার ফাঁদে ফেলে রাখতে চায়।

ইমাম মাহদী ও মসীহ হওয়ার দাবির অসারতা :

ইমাম মেহদী বা মসীহে মওউদ হওয়ার দাবি এবং এর ওপর ভিত্তি করে কাদিয়ানী নিজেকে নবী দাবি করার জোর প্রয়াস চালিয়েছে। সে কারণে উক্ত বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম মাহদী সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে–

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مكةَ فيأتيه ناسٌ مِنْ أهلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَه وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَه بَين الرُّكْن وَالْمقَام وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذٰلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذٰلِكَ بَعْثُ كلب وَيعْمل النَّاس بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, শেষ যুগে জনৈক খলীফার মৃত্যুর সময় নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে আর একজন

খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেবে। তখন মদীনা হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে মক্কার দিকে ছুটে পালাবে। এ সময় মক্কার লোকগণ তার নিকট এসে তাকে জবরদস্তিমূলক ঘর হতে বের করে আনবে; কিন্তু সে তা পছন্দ করবে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তিই মাহদী। সে ফেতনা অথবা নেতৃত্বের ভয়ে পলায়ন করবে; কিন্তু তার কর্মকাণ্ড এবং চেহারার ঔজ্জ্বল্যে লোকগণ তাকে চিনে ফেলবে যে, এ ব্যক্তিই ইমাম মাহদী। অতঃপর হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে লোকগণ তার নিকট বায়আত করবে। অতঃপর সিরিয়া হতে একটি সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হবে; কিন্তু মক্কা ও মদীনার মাঝখানে বায়দা নামক স্থানে তাদেরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে ফেলা হবে। তারপর এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে এবং লোকগণ এ অবস্থা চাক্ষুষ দেখলে সিরিয়ার আবদালগণ এবং ইরাকের এক বিরাট দল তার নিকট আগমন করে তার হাতে বায়আত করবে। অতঃপর কুরাইশদের এক ব্যক্তি যার মাতুল বংশ হবে বনু কালব। সেও ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করবে। ইমামের সেনাবাহিনী তাদের ওপর জয়লাভ করবে। এটাই ফেতনা এ কালব। ইমাম মাহদী মানুষের মধ্যে তাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী কাজকর্ম পরিচালনা করবেন এবং (তখন) দুনিয়ায় দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সাত বছর এ অবস্থায় অবস্থান করবেন। তারপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলমানগণ তাঁর জানাযা আদায় করবে। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪২৮৬)

ইমাম মাহদীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী :

আলোচ্য হাদীসে মদীনা থেকে উদ্দেশ্য মদীনা তায়্যিবা বা ওই শহর যেখানে খলীফা (রাষ্ট্র পরিচালক) মৃত্যুবরণ করবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনে জনগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি পালিয়ে যাবেন তিনিই হবেন ইমাম মাহদী। এর একটি প্রমাণ হলো ইমাম আবু দাউদ (রা.) হাদীসটিকে 'বাবুল মাহদী' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। ২। হাদীসের সিয়াক ও সবাক তথা আনুষঙ্গিকও এর প্রমাণ বহন করে। ৩। হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর আরেক হাদীসে المهدى من عترتى الخ উল্লেখ আছে। ৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর দুটি হাদীস থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় 'মাহদী' একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপনাম। এছাড়া অত্র বিষয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। তাই সময়ের দাবি হিসেবে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

مهدى শব্দের বিশ্লেষণ :

مهـــــــــــدى শব্দের অর্থ হলো, হেদায়াতপ্রাপ্ত, পথপ্রদর্শক, হাদী, কায়েদ, নেতা ইত্যাদি।

আভিধানিক অর্থ হিসেবে প্রত্যেক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মাহদী বলা যায়। যেমন জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) তাঁকে ইয়েমেনের 'জিল খালাসা' ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করলেন। যা ছিল 'কা'বায়ে ইয়ামানিয়্যা' নামে খ্যাত। তখন হযরত জরীর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঘোড়ার ওপর অটল হয়ে বসতে পারি না। জরীর বলেন, তখন নবী করীম (সা.) আমার বক্ষের ওপর হাত রাখলেন। এমনকি আমার বক্ষে তাঁর আঙুলের চাপ প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, আল্লাহ! তাঁকে ঘোড়ার ওপর অবিচল রাখ, তাঁকে হাদী এবং মাহদী বানিয়ে দাও। (বুখারী ১/৪২৪, মেশকাত ২/৫৩৫)

২। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

এই হাদীসে খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে মাহদী শব্দটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩। হযরত মু'আবিয়া (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به (ترمذى)

হাদীস শরীফে তাওয়াতুরের সাথে যে মাহদীর কথা এসেছে তা থেকে উদ্দেশ্য একজন ব্যক্তি, যিনি শেষ যামানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে আগমন করবেন। তাঁর আগমনের ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনাগুলো হযরত ঈসা (রা.)-এর আগমনের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর ন্যায় স্পষ্ট ও পরিষ্কার। সুতরাং সে ব্যাপারে ন্যূনতম সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই।

আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন–

فتقرر ان الاحاديث الواردة فى المهدى المنتظر متواترة والاحاديث الواردة فى نزول عيسى بن مريم متواترة (كتاب الاذاعة)

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) ইমাম মাহদী সম্পর্কে ১৮০টি হাদীস একত্রিত করেছেন "আল আরফুল ওয়ারদী ফী আখবারিল মাহদী" নামক কিতাবে। যে রকম "আততাসরীহ মিম্মা তাওয়াতারা ফী নুযুলিল মাসীহ" কিতাবে আল্লামা আনওয়ার শাহ কশ্মীরী (রহ.) ৭৩টি হাদীস ও ২৭টি আসার সংকলন করে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) আসমানে জীবিত আছেন এবং তিনি কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে

আগমন করবেন।

'মাহদাবিয়্যাত আওর যহুরে মাহদী' নামক কিতাবে লেখা হয়েছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে মাহদীর ব্যাপারে কোনো হাদীস নেই। এই কথা শুদ্ধ নয়। যদি সঠিকও ধরে নেওয়া হয় তথাপি এ কথা প্রমাণিত হবে না যে, ইমাম মাহদী সম্পর্কে হাদীসগুলো সহীহ নয়। কারণ সর্বস্বীকৃত বিষয় হলো, শুধু বুখারী-মুসলিমেই সব সহীহ হাদীস সীমাবদ্ধ, তা এমন কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

অনেকে ইমাম মাহদীসংক্রান্ত হাদীসগুলো সনদের দিক থেকে সহীহ নয় বলেও অপবাদ দিয়েছেন। অথচ কাসরাতে তুরুক তথা অধিক সূত্র ও সনদে হাদীসগুলো বর্ণিত হওয়ায় দুর্বলতা আর থাকে না।

ইমাম মাহদীর নাম কী হবে, তার কর্মপদ্ধতি, চরিত্র কী হবে? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন? কোথায় হিজরত করবেন? কোথায় তাঁর ইন্তেকাল হবে? বয়স কত হবে? কী কী কাজ করবেন, তাঁর হাতে সর্বপ্রথম কে বাইয়াত হবেন, কত দিন তাঁর ক্ষমতা টিকে থাকবে ইত্যাদি বিষয় হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী সিরহিন্দী (রহ.) লেখেন, ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) হযরত মাহদী সম্পর্কে একটি কিতাব লেখেছেন। তাতে ইমাম মাহদীর দুই শর মতো আলামত ও নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি লেখেন ইমাম মাহদীর অবস্থা ও অবস্থান সুস্পষ্ট হওয়ার পরও মানুষ গোমরাহ হচ্ছে।

هداهم الله سبحانه الى سواء الصراط

(মকতুবাত ২২০ দফতরে দুওয়াম, মাকতুব ৬৭ জহুরে মাহদী)

হযরত ঈসা ও ইমাম মাহদী দুই ব্যক্তি :

ইমাম মাহদীর আগমন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ সম্পর্কে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট যে, তাঁরা পৃথক দুই ব্যক্তি।

১। এর ওপর সকল সাহাবী ও তাবেয়ী একমত। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী গোলাম কাদিয়ানীর দাবি হলো, সে ঈসাও আবার মাহদীও। এটি বিকল মস্তিষ্কের কথা ছাড়া কিছু নয়। কারণ সে তো নিজেকে খোদা, খোদার পিতা, খোদার বীর্য, খোদার পুত্র, এমনকি খোদার স্ত্রী পর্যন্ত দাবি করেছে। (নাউজুবিল্লাহ) (হাকীকাতুল ওয়াহী, দাফেউল বালা, আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম ইত্যাদি) যে লোক এহেন উদ্ভট, অহেতুক কুরুচিপূর্ণ দাবি করতে পারে ইসলাম সম্পর্কে তার কিছু বলারও অধিকার থাকতে পারে না।

২। হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে হযরত ঈসা ও হযরত মাহদী দুজন পৃথক ব্যক্তি।

৩। হযরত ঈসা (আ.) মহান নবী ও রাসূল। স্বয়ং পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-এর যতগুলো আলামত ও নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে অন্য কোনো নবী-রাসূলের ব্যাপারে বলা হয়নি। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদী এক ব্যক্তি হওয়ার প্রশ্নই আসতে পারে না।

৪। ইমাম মাহদী মুসলিম মিল্লাতের সর্বশেষ খলীফায়ে রাশেদ। জমহুর উলামার মতে যাঁর মর্যাদা খোলাফায়ে রাশেদীনের সমান। অথবা বেশি। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন, সহীহ হাদীস ও ইজমা দ্বারা স্বীকৃত ও প্রমাণিত বিষয় হলো নবী-রাসূলের পরের স্তর হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর। (আল আরফুল ওয়ারদী ৭৭)

৫। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) লেখেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, পুরো দুনিয়ায় ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন চারজন। এর মধ্যে দুজন কাফের আর দুজন মুমিন। বখতে নসর আর নমরুদ ছিল কাফেরদের থেকে। যুল কারনাইন এবং সুলাইমান (আ.) ছিলেন মুমিন বাদশাহ। এই জমিনে পঞ্চম ক্ষমতাধর ব্যক্তি হবেন আমার আহলে বাইতের এক লোক। তথা ইমাম মাহদী। আরেক হাদীসে এসেছে ইমাম মাহদীর সহযোগী হবেন আসহাবে কাহাফ।

৬। হযরত ঈসা (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ফুৎকারে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঔরসে পিতাবিহীন জন্ম লাভ করেন। যা ছিল রাসূল (সা.)-এর আগমনের ৬০০ বছর পূর্বের ঘটনা। আর ইমাম মাহদী আহলে বাইতের মধ্য হতে হবেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মদীনা মুনাওয়ারায় জন্ম লাভ করবেন। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ। পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম হবে আমেনা। ইমাম মাহদী হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশসূত্রে রাসূল (সা.)-এর বংশধর হওয়ার কথা এত বেশি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা মুতাওয়াতেরের স্তরে পৌঁছে যায়। (শরহে আকীদায়ে সাফারানিয়া ২/৬৯, নুযূলে ঈসার সূত্রে)

ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম বায়হাকী (রহ.), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.), ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.), আবু নাঈম, ইবনে খুজাইমা, শায়খ আলী মুত্তাকী, আবু ইয়ালা, ইবনে আবী শায়বা, ইমাম কুরতুবী, ইবনে আরবী (ফুতুহাতে মক্কিয়ায়), শায়খ তাহের পাঠানী (তাকমালাযে মাজমাউল বিহার

কিতাবে), আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) এবং ইমাম মাহদী (আ.) দুজন পৃথক ব্যক্তি হবেন।

لا مهدى الا عيسى بن مريم এর ব্যাখ্যা :

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْجَنَدِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا إِدْبَارًا، وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًّا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

নবী (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না; কিন্তু অসৎ লোকদের ওপর। আর ঈসা ইবনে মারইয়াম ছাড়া কোনো মাহদী নেই। (ইবনে মাজাহ, হা. ৪০৩৯)

কাদিয়ানীদের "মহা সংবাদ"সহ বিভিন্ন কিতাবে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদী একই ব্যক্তি বলে দাবি করে এর প্রমাণস্বরূপ এই হাদীস উপস্থাপন করা হয়। এর সাথে তারা প্রমাণ করতে চায় মির্জা কাদিয়ানী নাকি ঈসাও আবার মাহদীও।

উত্তর :

সুনআনী বলেছেন, لامهدى الا عيسى بن مريم হাদীসটি মওজু। আল্লামা যাহাবী বলেছেন এটি মুনকার। এই হাদীসে ইউনুস ইবনে আব্দিল আ'লা, শাফেয়ী থেকে সনদটিতে ইউনুস একা বর্ণনা করেছেন। আযদী বলেছেন,

মুহাম্মদ ইবনে খালেদ মুনকারুল হাদীস। হাকেম বলেছেন, সে মজহুল তথা অপরিচিত। (ফতহুল বারী ৬/৩৫৮)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, মুহাম্মদ বিন খালেদ জুনদী মজহুল। (তাহযীবুত তাহযীব ৯/১৪৫), মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, এই হাদীসটি সকল মুহাদ্দিসের মতে জয়ীফ। (মেরকাত), ইমাম বায়হাকী লেখেন,

এই হাদীসের বর্ণনাকারী 'জুনদী' মজহুল, আরেক বর্ণনাকরী আব্বান মতরুকুল হাদীস। আরো বিস্তারিত জানার জন্য সুনানে ইবনে মাজাহর টীকা দ্রষ্টব্য। (ইবনে মাজাহ ২৯৩)। সুতরাং হাদীসটি কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২। যেখানে অগণিত সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আ.) দুই ব্যক্তি হওয়া দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, সেখানে এই হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।

৩। উক্ত হাদীসে উল্লিখিত শব্দ مهدى থেকে আভিধানিক অর্থই উদ্দেশ্য। হাদীসের প্রথম অংশ لاتقوم الساعة الا على شرار الناس তারই প্রমাণ বহন করে। কারণ সে সময় ইমাম মাহদী ইন্তেকাল করবেন। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর জানাযা পড়াবেন। তখন দুনিয়ায় শুধুমাত্র অসৎ লোকই থাকবে। আর হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকবেন শুধু হযরত ঈসা (আ.)।

৪। সে সময় হযরত ঈসা (আ.)-এর চেয়ে বড় হেদায়াতপ্রাপ্ত লোক থাকবে না। কারণ তিনি নবী। আর নবীগণ মাসুম। ইমাম মাহদী তো খলীফায়ে রাশেদ। তিনি নবীর স্তরের হবেন না। মাসুম হওয়ার বিষয়টি নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। ওলীগণ মাহফুজ তথা সংরক্ষিত হয়ে থাকেন। যেমন لافتى الا على এর অর্থ এই নয় যে, দুনিয়াতে হযরত আলী (রা.) ছাড়া কোনো যুবক নেই। বরং এর অর্থ হলো যুবকদের মধ্যে পৃথিবীতে হযরত আলী (রা.)-এর মতো সাহসী কেউ নেই। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের অর্থ হবে لامهدى كاملا معصوما الا عيسى পরিপূর্ণ হেদায়াতপ্রাপ্ত মাসুম হযরত ঈসার মতো সে সময় আর কেউ থাকবে না। (ফয়জুল কাদীর ৬/২৭৯, আল আরফুল ওয়ারদী ৮৬)

وقال ابن كثير المراد من ذلك ان المهدى حق المهدى هو عيسى ولا ينفى ذلك ان يكون غيره مهديا

অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ তো মাহদী হবেন। কিন্তু পরিপূর্ণ ও সবচেয়ে বড় মাহদী হবেন হযরত ঈসা (আ.)।

৫। যুগ হিসেবে অতি নিকটবর্তী হওয়ায় এভাবে বলা হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে আছে–

عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح قسطنطينية خروج الدجال (مشكوة)

অর্থাৎ ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগ প্রায় এক।

৬। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) লেখেন, এ রূপ তারতীব পরিপূর্ণ সাদৃশ্যতা দেখানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই দুই বুজুর্গের মধ্যে সাদৃশ্যতা এতই পরিপূর্ণ যে, যেন ইমাম মাহদী হযরত ঈসা (আ.)-এর মতোই। কবি আমীর খসরু যেমন বলেন–

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی
تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও বিন্যাস
মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া।

নারী-পুরুষের নামায আদায়ের পদ্ধতি কি এক?

মুফতি কিফায়তুল্লাহ শফিক

ইসলামী শরীয়তের অধিকাংশ হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে একইভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। নামায, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি পুরুষের বেলায় যে রকম নারীর বেলায়ও সে রকম। তবে সৃষ্টিগত ব্যবধানের কারণে নারীদের কোনো কোনো ইবাদতের আদায় পদ্ধতিতে শরীয়ত পুরুষ থেকে ভিন্ন পদ্ধতি দান করেছে।

মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদতসমূহের মধ্যে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। উক্ত নামাযের প্রায় সকল বিষয়ে নারী-পুরুষ এক ধরনের হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস শরীফের আলোকে আদায় পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট ভিন্নতা প্রমাণিত হয়।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানা থেকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবতাবেঈনগণ বিষয়টি খুব সহজভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্দেশিত উক্ত পার্থক্য সকলেই মেনে নিয়েছেন। এমনকি প্রসিদ্ধ চার ইমামগণও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে তার বিপরীতে এমন একটি হাদীস শরীফও পাওয়া যাবে না, যাতে বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও নারীর নামাযের আদায় পদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য নেই।

নিম্নে বর্ণিত সহীহ হাদীস শরীফসমূহ মনোযোগের সাথে পাঠ করলে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের সত্য-সন্ধানী পাঠক সহজেই অনুমান করতে সক্ষম হবেন যে, নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্যের বিষয়টি নতুন কিছু নয় বরং এটি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামগণের যুগ থেকেই চলে আসছে এবং এর পক্ষে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয়, সাম্প্রতিক কিছু কিছু 'ইসলামী চিন্তাবিদ' পূর্ব থেকে চলে আসা সুসাব্যস্ত এ মত ও পথকে উপেক্ষা করে নিজেদের 'গবেষণা'লব্ধ মত ও পথকে জনগণের মাঝে চালিয়ে দিয়ে সরলমনা মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তরিকভাবে দু'আ করছি, আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াত দান করুক এবং আগত-অনাগত সকল মুসলমানকে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফীক দান করুক। আমীন।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (آل عمران : ٣١)

আল্লাহ তা'আলা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলেন, "আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সূরা আলে ইমরান-৩১)

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহীহ হাদীস শরীফ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মত ও কর্ম, তাবেঈ, ইমামগণের ঐকমত্য ও প্রসিদ্ধ চার ইমামের সম্মিলিত মতামতের আলোকে নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্যসমূহ :

১. মহিলাগণের নিজ ঘরে নামায আদায় করা উত্তম। পক্ষান্তরে পুরুষগণ ফরয নামায মসজিদেই আদায় করবে।

لماروى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي .(مسند أحمد -٤٥/ ٣٧) صحيح ابن خزيمة -١/ ١١٤) صحيح ابن حبان -٨/ ٦)

هذا الحديث الشريف دليل واضح على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد النبوى الشريف.

(صحيح كنوز السنة النبوية (ص :١٨)

অর্থ : "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সুয়ায়দ আল-আনছারী (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি তাঁর ফুফি উম্মে হুমায়দ আস-সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (উম্মে হুমায়দ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে নামায

আদায় করতে পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি জেনেছি নিশ্চয়ই তুমি আমার সাথে নামায পড়তে পছন্দ করো (তবে) তোমার জন্য হুজরায় (বড় কামরায়) নামায পড়ার চেয়ে অন্দর মহলে (ছোট কামরায়) নামায পড়া উত্তম। হুজরায় (বড় কামরায়) নামায পড়া ঘরের আঙিনায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। ঘরের আঙিনায় নামায পড়া নিজ মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম আর আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) নামায পড়ার চেয়ে নিজ মহল্লার মসজিদে নামায পড়া উত্তম।" (মুসনাদে আহমদ-৪৫/৩৭, ইবনে খুযায়মা-১/১১৪, ইবনে হিব্বান-৮/৬২)

এ হাদীস শরীফ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মেয়েদের জন্য মসজিদে নববীতে নামায পড়ার চেয়ে নিজ ঘরেই নামায পড়া উত্তম। (কুনূযুস্‌সুন্নাহ- পৃ : ১৮২)

لماروى عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ :صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي دَارِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عُمَرُ : وَلِمَ تُطَوِّلُ ؟ سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يَحْلِفُ فَيُبْلِغُ فِي الْيَمِينِ "مَا مُصَلًّى لامْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا إِلا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ...(مصنف عبدالرزاق لأبو بكر الصنعانى -٣/ ١٥٠)

অর্থ : হযরত আবু আমর আশ-শায়বানী (রহ.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, 'বলা হতো, মহিলার নামায তার শোয়ার ঘরেই ভালো বড় ঘরের তুলনায়। তখন আবু উমর তাকে বললেন, এত বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন কেন? আমি তো এ ঘরের মালিক হযরত ইবনে মাসউদকে খুব জোরালো শপথ খেয়ে বলতে শুনেছি, নারীর জন্য নিজের ঘরের চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু হজ ও ওমরার অবস্থা হলে ভিন্ন কথা। (মুসান্নাফে আবদুর রয্যাক : ৩/১৫০)

২. মহিলাগণের (কোনো পরপুরুষ না থাকলে) চেহারা, কব্জি পর্যন্ত দুই হাত এবং দুই পায়ের পাতা ব্যতীত মাথার চুলসহ সমস্ত শরীর কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা ফরয। পক্ষান্তরে পুরুষগণের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখলেই যথেষ্ট।

لماروى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ .(سنن الترمذى -/ ١٥)

অর্থ : "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার নামায ঘোমটা (ওড়না) ব্যতীত কবুল হয় না।" (তিরমিযী শরীফ : ২/২১৫)

৩. মহিলাগণের তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। পক্ষান্তরে পুরুষগণ কান বরাবর উঠাবে।

لماروى عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زَيْتُونَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ .(مصنف ابن أبى شيبة -١/ ٢٣)

অর্থ : "হযরত আবদে রব্ ইবনে যায়তূন (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি উম্মে দারদা (রা.)-কে নামায শুরু করার সময় তার হাতদ্বয় কাঁধ বরাবর উঠাতে দেখেছি।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা : ১/২৩৯)

لماروى عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ .... فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ !إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا .(المعجم الكبير الطبرانى -٢٢/ ١)

অর্থ : "হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে এলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, হে ওয়ায়েল ইবনে হুজর! যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াবে তোমার হাতদ্বয় দুই কান বরাবর উঠাবে আর মহিলারা তাদের দুই হাত সিনা বরাবর উঠাবে।" (ত্ববরানী শরীফ : ২২/১৯)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত হায়ছমী (রহ.) বলেন, এই হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, উম্মে ইয়াহইয়া ব্যতীত। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনিও প্রসিদ্ধ।

لماروى عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا .(مصنف ابن أبى شيبة (٢٣٩ /١)

অর্থ : "হযরত ইমাম যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, নারীরা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে।" (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ১/২৩৯)

৪. দুই হাত কাপড়ের ভেতর থেকে বের না করা। পক্ষান্তরে পুরুষগণ দুই হাত কান বরাবর উঠাবে।

المرأة تخالف الرجل فى مسائل منها هذه ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها ولا تفرج أصابعها فى الركوع وتنحنى فى الركوع قليلا بحيث تبلغ حد الركوع فلا تزيد على ذلك لأنه أستر لها .(حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح (٢/ ١٣٣)

অর্থ : মহিলাগণ নামাযের কিছু কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে পুরুষদের ব্যতিক্রম করবে। তন্মধ্যে তাকবীরের সময় হাত জামার আস্তিন থেকে বের করবে না এবং উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে

مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنَةٍ لِسَعْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوعِ تُطَأْطِؤًا مُنْكَرًا فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ :إِنَّمَا يَكْفِيكِ إِذَا وَضَعْتِ يَدَيْكِ عَلَى رُكْبَتَيْكِ .(مصنف ابن أبى شيبة (١/ ٥١)

অর্থ : "হযরত আয়েশা বিনতে সা'আদ থেকে বর্ণিত : তিনি রুকুতে খুব বেশি ঝুঁকতেন যা দৃষ্টিকটু। অতঃপর হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) তাকে বললেন, তোমার দুই হাত হাঁটুতে রাখলে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।"

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ১/২৫১)

ولا تفرج أصابعها فى الركوع وتنحنى فى الركوع قليلا بحيث تبلغ حد الركوع فلا تزيد على ذلك لأنه أستر لها .

(حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح (/ ١٣٣)

অর্থ : আর রুকুর মধ্যে হাতের আঙুলসমূহ ছড়িয়ে রাখবে না। রুকুতে এভাবে সামান্য ঝুঁকবে যাতে করে রুকু শুদ্ধ পরিমাণ হয়ে যায়। এর চেয়ে বেশি ঝুঁকাবে না। কেননা তা মহিলাদের জন্য অধিক পর্দা রক্ষাকারী। (মারাক্বিউল ফালাহ : ২/১৩৩)

১০. মহিলাগণ সিজদায় দুই হাত জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। পক্ষান্তরে পুরুষগণ জমি থেকে দূরে রাখবে।

لماروى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ :إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ .(مراسيل أبى داود -١/ ١٠٧)

অর্থ : "হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবি হাবীব (রা.) থেকে বর্ণিত : 'রাসূলুল্লাহ (রা.) বলেন : মহিলাগণ যখন রুকু করবে জড়োসড়ো হয়ে করবে। হাত উঁচু করে পেটের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে থাকবে।"

(মুসান্নাফে আবদুর রয্যাক : ৩/১৩৭)

৮. মহিলাগণের রুকুতে উভয় বাহু পাঁজরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলিয়ে রাখা।

لماروى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ .

(مصنف عبد الرزاق الصنعانى (٣/ ١٣٧)

অর্থ : "হযরত আ'তা বিন আবী রবাহ (রহ.) বলেন : মহিলাগণ যখন রুকু করবে জড়োসড়ো হয়ে করবে। হাত উঁচু করে পেটের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে থাকবে।" (মুসান্নাফে আবদুর রয্যাক-৩/১৩৭)

لماروى عَنْ حَفْصٍ عَنِ الْجَعْدِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنَةٍ لِسَعْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوعِ تُطَأْطِؤًا مُنْكَرًا فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ :إِنَّمَا يَكْفِيكِ إِذَا وَضَعْتِ يَدَيْكِ عَلَى رُكْبَتَيْكِ .(مصنف ابن أبى شيبة -١/ ٢٥١)

অর্থ : "হযরত আয়েশা বিনতে সা'আদ থেকে বর্ণিত : তিনি রুকুতে খুব বেশি ঝুঁকতেন যা দৃষ্টিকটু। অতঃপর হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) তাকে বললেন, তোমার দুই হাত হাঁটুতে রাখলে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।"

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা-১/২৫১)

৯. মহিলাগণের রুকুতে উভয় হাত হাঁটুর ওপর স্বাভাবিকভাবে রাখা এবং হাতের আঙুলসমূহ মিলিয়ে রাখা। পক্ষান্তরে পুরুষগণ আঙুল ছড়িয়ে দুই হাঁটু শক্ত করে ধরবে।

لماروى عَنْ حَفْصٍ عَنِ الْجَعْدِ رَجُلٌ

আর রুকুর মধ্যে হাতের আঙুলসমূহ ফাঁক রাখবে না। রুকুতে এভাবে সামান্য ঝুঁকবে যাতে করে রুকু শুদ্ধ পরিমাণ হয়ে যায়। এর চেয়ে বেশি ঝুঁকাবে না। কেননা তা মহিলাদের জন্য অধিক পর্দা রক্ষাকারী। (মারাক্বিউল ফালাহ : ২/১৩৩)

৫. মহিলাগণ দুই হাত বুকের ওপর রাখবে। পক্ষান্তরে পুরুষগণ নাভির নিচে রাখবে।

و "يسن "وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق "لأنه أستر لها .

(حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح (٢/ ١٣٢)

অর্থ : মহিলাদের জন্য বৃত্ত তৈরীকরণ তথা পুরুষদের মতো এক হাত দ্বারা আরেক হাত বেষ্টন করে ধরা ছাড়া বক্ষের ওপর (স্বাভাবিকভাবে) হাত রাখা সুন্নাত। কেননা তাদের জন্য এটিই অধিক পর্দা রক্ষণে সহায়ক। (মারাক্বিউল ফালাহ : ২/১৩২)

৬. আঙুলসমূহ মিলিয়ে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর স্বাভাবিকভাবে রাখবে। পক্ষান্তরে পুরুষগণ বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরবে।

عورت سینہ پر ہاتھ رکھے اس طرح کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے حلقہ نہ بنائے۔ (فتوی رحیمیہ : ٢٢٢/٧)

৭. মহিলাগণ রুকুতে পুরুষদের তুলনায় কম ঝুঁকবে। পক্ষান্তরে পুরুষগণ ভালোভাবে ঝুঁকে যাবে।

لماروى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ .

(مصنف عبد الرزاق الصنعانى (٣/ ١٣٧)

অর্থ : "হযরত আ'তা বিন আবী রবাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুজন নামাযরত মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি (তাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, "তোমরা সিজদা করার সময় শরীরের কিছু অংশ মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। কারণ, এতে (সিজদার মধ্যে) মেয়েদের হুকুম পুরুষদের মতো নয়।" (মারাসিলে আবী দাউদ-১/১০৭)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ শুআইব আরনাউত (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী প্রত্যেক রাবী সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হাদীসটি "সহীহ"। (তা'লীক আলা মারাসীলে আবী দাউদ : পৃ. ১১৭)

১১. মহিলাগণ সিজদায় উভয় রানের সাথে পেট মিলিয়ে রাখবে। পক্ষান্তরে পুরুষগণ দুই রানকে পেট থেকে পৃথক রাখবে।

لماروى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ ، فَقَالَ : إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ . (مراسيل أبى داود -١/ ١٠٧)

অর্থ : "হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবী হাবীব (রহ.) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুজন নামাযরত মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি (তাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, "তোমরা সিজদা করার সময় শরীরের কিছু অংশ মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। কারণ, এতে (সিজদার মধ্যে) মেয়েদের হুকুম পুরুষদের মতো নয়।" (মারাসিলে আবী দাউদ : ১/১০৭)

لماروى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الْأُخْرَى وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا .(سنن البيهقى -٢/ ٤٦٥)

অর্থ : "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ? থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, 'যখন মহিলারা নামাযের মধ্যে বসবে তখন এক উরু অপর উরুর ওপর রাখবে আর যখন সিজদা করবে তখন নিজের পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে, যা তার জন্য পর্দা পালনে খুবই সহায়ক হবে।" (বাইহাক্বী শরীফ : ২/৪৬৫)

لماروى عَنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رض : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا. (سنن البيهقى -٢/ ٤٦٣)

অর্থ : "হযরত হারেস (রহ.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মহিলারা সিজদা করার সময় উরুদ্বয় (পেটের সাথে) মিলিয়ে রাখবে তথা খুব সংকুচিত হয়ে সিজদা করবে।" (বাইহাক্বী শরীফ : ২/৪৬৩)

لماروى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَلْزَقْ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَلَا تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا وَلَا تُجَافِي كَمَا يُجَافِي الرَّجُلُ .

(مصنف ابن أبى شيبة -١/ ٧٠)

অর্থ : "হযরত ইবরাহীম নখঈ (রহ.) বলেন, নারীগণ যখন সিজদা করবে তখন পেট দুই উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং নিতম্ব উঁচু করে রাখবে না এবং (বাহুদ্বয় শরীর থেকে) পৃথক রাখবে না যে রকম পুরুষগণ রাখে।" (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ১/২৭০)

لماروى عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا وَلْتَضَعْ بَطْنَهَا عَلَيْهِمَا .(مصنف ابن أبى شيبة - ١/ ٢٧٠)

অর্থ : "হযরত ইবরাহীম নখঈ (রহ.) বলেন : মহিলাগণ যখন সিজদা করবে তখন পেট দুই উরুর ওপর রাখবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ১/২৭০)

১২. মহিলাগণ অত্যন্ত জড়োসড়ো ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করবে। পক্ষান্তরে পুরুষগণ এমনভাবে সিজদা করবে যাতে তার নিচ দিয়ে অন্তত একটি ছাগলছানা চলাচল করতে পারে।

لماروى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ... :فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ .

(مصنف عبد الرزاق الصنعانى -٣/ ١٣٧)

অর্থ : "হযরত আ'তা বিন আবী রবাহ (রা.) বলেন : মহিলাগণ যখন সিজদা করবে দুই হাত শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে আর পেট ও সিনা উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং যথাসম্ভব সংকুচিত ও জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। (মুসান্নাফে আবদুর রয্যাক : ৩/১৩৭)

لماروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ :تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ .

(مصنف ابن أبى شيبة -١/ ٢٠)

অর্থ : "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে মহিলাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, মহিলাগণ জড়োসড়ো ও সংকুচিত হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায পড়বে।" (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ১/২৭০)

لمارى عَنْ مَيْمُونَةَ رض قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .(صحيح مسلم -٢/ ٥٣) (البهمة :ولد الضأن الذكر والأنثى

অর্থ : "হযরত মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

এমনভাবে সিজদা করতেন যে, যদি একটি ছাগলছানা বুকের নিচ দিয়ে যেতে চায় যেতে পারত। (মুসলিম শরীফ : ২/৫৩)

لماری عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ . (سنن أبی داود (١/ ٣٣٩)

অর্থ : "হযরত মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সিজদা করতেন হাতদ্বয়ের মাঝখানে এমনভাবে ফাঁক রাখতেন যাতে করে যদি বগলের নিচ দিয়ে ছাগলের বাচ্চা চলাচল করতে চায় করতে পারে। (আবু দাউদ শরীফ : ১/৩৩৯)

১৩. মহিলাগণ উভয় কনুই সাধ্যমতো মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। পক্ষান্তরে পুরুষগণ মাটি থেকে পৃথক রাখবে।

لماروی عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ : إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ .(مراسيل أبی داود -١/ ١٠٧)

অর্থ : "হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবী হাবীব (রহ.) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুজন নামাযরত মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি (তাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, "তোমরা সিজদা করার সময় শরীরের কিছু অংশ মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। কারণ, এতে (সিজদার মধ্যে) মেয়েদের হুকুম পুরুষদের মতো নয়।" (মারাসিলে আবী দাউদ : ১/১০৭)

১৪. মহিলাগণ বাম নিতম্বের ওপর বসে দুই পা ডান দিকে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে এবং দুই পায়ের আঙুলসমূহ যথাসম্ভব কিবলামুখী করে রাখবে।

لماروی عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ . (مصنف ابن أبی شيبة -١/ ٢٧٠)

অর্থ : "হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, নামাযে বসার সময় মহিলাদেরকে চারজানু তথা এক পায়ের ওপর আরেক পা আড়াআড়িভাবে রেখে বসার নির্দেশ দেওয়া হতো এবং তারা যেন পুরুষদের মতো না বসে (আবরণযোগ্য কোনো কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় নারীদেরকে এমনটি করতে হয়)।" (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা :১/২৭০)

لماروی عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ...كَانَ يَأْمُرُ الرِّجَالَ أَنْ يَفْرِشُوا الْيُسْرَى وَيَنْصِبُوا الْيُمْنَى فِي التَّشَهُّدِ وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ .(سنن البيهقی -٢/ ٤٦٤)

অর্থ : "হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষদেরকে তাশাহ্হুদের মধ্যে বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া রাখার নির্দেশ দিতেন আর মহিলাদেরকে চারজানু তথা এক পায়ের ওপর আরেক পা আড়াআড়িভাবে রেখে বসার নির্দেশ দিতেন।" (বাইহাক্বী শরীফ : ২/৪৬৪)

لماروی عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا .(مصنف ابن أبی شيبة -١/ ٢٦)

অর্থ : "হযরত হারেস (রহ.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মহিলাগণ সিজদা করার সময় যথাসম্ভব গুটিয়ে যাবে এবং উরুদ্বয় (পেটের সাথে) মিলিয়ে রাখবে তথা খুব সংকুচিত হয়ে সিজদা করবে।" (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ১/২৬৯)

لماروی عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ تُصَلِّي وَهِيَ مُتَرَبِّعَةٌ .(مصنف ابن أبی شيبة -١/ ٢٠)

অর্থ : "হযরত নাফে (রহ.) বলেন : হযরত ছফিয়া {ইবনে উমর (রা.)-এর স্ত্রী} নামায পড়ার সময় চারজানু হয়ে তথা এক পায়ের ওপর আরেক পা আড়াআড়িভাবে রেখে বসতেন।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা : ১/২৭০)

لماروی عَنْ نَافِعٍ قَالَ :كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ .(مصنف ابن أبی شيبة -١/ ٢٧٠)

অর্থ : "হযরত নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর স্ত্রীগণ নামাযে চারজানু হয়ে তথা এক পায়ের ওপর আরেক পা আড়াআড়িভাবে রেখে বসতেন।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা : ১/২৭০)

وتلزم مرفقيها بجنبيها فيه وتلزق بطنها بفخذيها فی السجود وتجلس متوركة فی كل قعود بأن تجلس علی أليتها اليسری وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن وتضع فخذيها علی بعضهما وتجعل الساق الأيمن علی الساق الأيسر كما فی مجمع الأنهر . (حاشية الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح -٢/ ١٣٣)

অর্থ : মহিলাগণ সিজদার মধ্যে কনুদ্বয় পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেট উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে। মহিলাগণ প্রতি বৈঠকে নিতম্বে ভর দিয়ে তথা বাম নিম্বে ভর দিয়ে বসবে এবং ডান দিকে উভয় পা বের করে দেবে ও উরুদ্বয় উভয় পায়ের কিছু অংশের ওপর রাখবে আর ডান পায়ের গোছা বাম পায়ের গোছার ওপর রাখবে। (মারাক্বিউল ফালাহ : ২/১৩৩)

পবিত্র সীরাতে নামাযের গুরুত্ব

মুফতি শরীফুল আজম

আল্লাহর কাছে ডেকে নামায প্রদান :

নামায হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। ইসলামে যত বিধি-বিধান রয়েছে তার মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নামায। অন্যান্য ইবাদতের নির্দেশ হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে নবীজির (সা.) কাছে পাঠানো হয়েছে। আর নামাযের বিধান মেরাজ রজনীতে নবীজিকে (সা.) আল্লাহর কাছে ডেকে নিয়ে প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ : পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়ে ছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (সূরা বনী ইসরাঈল-১)

উক্ত সফরে দুটি অংশ ছিল, একটিকে ইসরা অপরটিকে মেরাজ বলা হয়। মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে ইসরা বলে। পবিত্র কোরআনে যার বর্ণনা এসেছে। অতঃপর সেখান থেকে সাত আসমান ও জান্নাত-জাহান্নামসহ আরশ পর্যন্ত ভ্রমণকে মেরাজ বলা হয়। সহীহ বোখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে যার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে।

নবীজি (সা.)-এর সীরাতের সর্বাধিক অলৌকিক এই ভ্রমণে উম্মতের জন্য নামাযের বিধান প্রদান করা হয়। প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ হয়েছিল। এই আদেশ নিয়ে ফিরে আসার পথে নবীজি (সা.)-এর সাথে হযরত মুসা (আ.)-এর দেখা হয়। পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের কথা শুনে তিনি বললেন, আপনার উম্মতের পক্ষে এটা সম্ভব হবে না। আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং কিছু কমানোর আবেদন করুন। নবীজি (সা.) ফিরে গেলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত কমানো হলো। এভাবে কয়েক দফায় পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত কমানো হলো। বাকি রইল শুধু পাঁচ ওয়াক্ত। আর পাঁচকে দশ গুণ বৃদ্ধি করে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান মর্যাদা প্রদান করা হলো।

فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى(مسلم ٢٥٩[١٦٢])

ব্যতিক্রমধর্মী এই পদ্ধতির মাধ্যমে নামাযের বিধান জারি হওয়ার মাঝে এর গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, الصَّلَاةُ عِمَادُ الْإِسْلَامِ নামায ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ। (আত্তারগীব হা. ৪৪৪)

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ،

বিচার দিবসে বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। (ইবনে মাজাহ হা. ১৪২৫)

আল্লাহ তা'আলা নামাযের প্রতিটি রাকআতে এমন সব ইবাদাত একত্র করে দিয়েছেন, যা ফেরেশতাদের সকলে মিলে পৃথক পৃথক পালন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এমন একদল ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যারা সর্বদা রুকুতে মশগুল থাকে। সৃষ্টিলগ্ন থেকে রুকুতেই আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত রুকুতেই থাকবে। এভাবে সিজদা, কিয়াম, কেরাত এবং বৈঠকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল নিয়োজিত রয়েছে। আর মানুষের জন্য এসব কিছু নামাযের এক রাকআতের মাঝে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

তাছাড়া নামায বহুবিদ ইবাদতের এমন এক সমষ্টি, যা অন্য কোনো ইবাদতে পাওয়া যায় না। এতে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে পবিত্রতা, কেবলামুখী হওয়া, তাকবীরে তাহরীমা, অন্যান্য তাকবীর, কেরাত, কিয়াম, রুকু, সিজদা, তাসবীহ, দু'আ, একাগ্রতা এবং খুশুখুযুর মতো গুরুত্বপূর্ণ সব ইবাদতের। (মাদারেজুন্ নবুওয়্যা-১/৬০৬)

ফেরেশতার মাধ্যমে ওয়াক্ত নির্ণয় :

মেরাজ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে ফিরে আসার পর ওয়াক্ত নির্ণয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত জিব্রাইল (আ.) এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে জামাআতে নামায আদায় করলেন। পর পর দুই দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে ওয়াক্তের শুরু এবং শেষ নির্ণয় করে দিলেন, প্রথম দিনের নামাযসমূহ ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করলেন, আর দ্বিতীয় দিন ওয়াক্তের শেষে আদায় করলেন। তবে মাগরীবের নামায দুই দিনই একই সময় আদায় করলেন, নামায শেষে হযরত জিব্রাইল (আ.) নবীজিকে (সা.) বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! এটা আপনার পূর্ববর্তী নবীদের ওয়াক্ত। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময় হচ্ছে নামাযের ওয়াক্ত।

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ،

وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (ابوداود ٣٩٣)

মেরাজের অব্যাহত ধারা নামায :

মেরাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভের যে স্বাদ নবীজি (সা.) আস্বাদন করেছিলেন, তা অবর্ণনীয়। আল্লাহ প্রেমের যে শীতলতা তাঁর হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল, তা অকল্পনীয়। মহামহিমের নূরের ঝলকানিতে যেভাবে স্নাত হয়েছিল তাঁর পবিত্র অন্তরাত্মা, তা অভাবনীয়। আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন তিনি। পুলকিত হয়েছিলেন প্রতিটি মুহূর্ত। মেরাজের সেই মধুর স্মৃতিচারণ হয়ে থাকে নামাযের মাঝে। তাই তো নবীজি (সা.) বলেছেন, الصلوة معراج المؤمنين নামায মুমিনের মেরাজ। এখানে মুমিন দ্বারা উদ্দেশ্য স্বয়ং নবীজি (সা.)-এর পবিত্র সত্তা। অতঃপর নবীজি (সা.)-এর ইত্তিবার বরকতে প্রত্যেক মুমিন নিজ নিজ ঈমান-আমলের স্তর অনুপাতে এই মর্যাদা লাভ করে থাকে। এভাবে নামাযের মাধ্যমে মেরাজের ধারা বজায় থাকে।(মাদারেজুন নবুওয়্যাহ-১/৬০৬)

মেরাজে যেভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে নবীজির কথোপকথন হয়েছে, নামাযেও তা হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে আছে, বান্দা যখন নামাযে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করে الحمد لله رب العالمين "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক"। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর আসে حمدنى عبدى আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বান্দা তিলাওয়াত করে الرحمن الرحيم "যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, اثنى على عبدى আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন করেছে। বান্দা যখন বলে, مالك يوم الدين "যিনি বিচার দিনের মালিক"। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, مجدنى عبدىআমার বান্দা আমার বড়ত্ব বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, ايـاك نعبد وايـاك نستعين "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি"। তখন আল্লাহ তা'আলা এটাকে بينى وبين عبدى বলে বান্দা ও নিজের মাঝে বণ্টন করে নেন। এরপর বান্দা যখন সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وآخـــر السورة لعبدى ولعبدى ماسأل "সূরার শেষ পর্যন্ত আমার বান্দার অংশ, আর আমার বান্দার সকল চাওয়া পূরণ করা হলো।" (তিরমিযী-হা. ২৯৬৯)

এভাবে তন্ময় হয়ে নামায আদায় হলে মেরাজের স্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠাই স্বাভাবিক। তাই তো নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন,

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

আমার চোখের শীতলতা নামাযে। (মুজামুল কাবীর হা.১০১২) অর্থাৎ আমার আত্মার প্রশান্তি নামাযের মাঝে। নামাযে তাঁর চিত্তে যে সুখ অনুভব হতো, যে স্বাদ এবং অনুভূতি লাভ করতেন, অন্য কোনো ইবাদতে তেমন হতো না।

উক্ত হাদীসে قرة العين "চোখের শীতলতা" রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাঙ্ক্ষিত বস্তু এবং অদৃশ্যের নূর লাভের সুখ ও আনন্দ قـرة শব্দটি قر এর মাঝে যবর দিয়ে পড়া হলে, অর্থ হবে স্থায়িত্ব বা স্থিরতা। প্রিয় জিনিসের দর্শন লাভে চোখ স্থির ও শান্ত হয়ে থাকে এবং ওই মুহূর্তে তাতে দৃষ্টি আটকে থাকে। পক্ষান্তরে অপছন্দের বস্তুর দর্শন লাভ হলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে এবং অস্থির হয়ে ওঠে।

অথবা قرة শব্দটি ق এর মাঝে পেশ দিয়ে قـــــر পড়া হলে, অর্থ হবে শীতলতা। প্রিয়জনের দর্শনে চোখ জুড়ায়, আর দুশমনের সাক্ষাতে চোখ রক্তিম হয়ে কাটা অনুভব হয়। নবীজি (সা.)-এর নামায ছিল মেরাজের মধুর স্মৃতিবিজড়িত। তাই প্রিয়জনের সাক্ষাতে তিনি নামাযের মাঝে চরম সুখ ও প্রশান্তি লাভ করতেন। কাজেই নামাযকে তিনি চোখের শীতলতা আখ্যা দিয়েছেন।

(মাদারেজুন্ নবুওয়্যাত-১/৬০৬)

রাতভর নামায :

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের মুখের তিলাওয়াত শুনতে চান। তিলাওয়াতের আদেশ নিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হলো,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। (আনকাবুত-৪৫)

আল্লাহর হাবীব (সা.)-এর মন এই নির্দেশ পেয়ে আরো ব্যাকুল হয়ে পড়ল। সারা রাত তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে লাগলেন। সাথে আছেন সাহাবায়ে কেরামের একটি দল। দিনভর দাওয়াতের মেহনত, আর রাতভর নামায। বিছানায় কারো পিঠ লাগে না। এমন পরিশ্রমের ফলে সকলের পা ফুলে যায়। মক্কার কাফেররা সুযোগ বুঝে মুসলমানদের প্রতি বিদ্রুপ বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কোরআন তো নয়, সাক্ষাৎ বিপদ নাযিল হয়েছে। রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও

শান্তি নেই।

এবার আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে সান্ত্বনা দিয়ে থামালেন। বললেন, আপনাকে এমন কষ্টে ফেলার জন্য আমি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। সারা রাত জাগ্রত থাকার এবং কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। ইরশাদ হচ্ছে,

طٰه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢)

অর্থ : তোয়া-হা, আপনাকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। (সূরা ত্বোয়া-হা.-১-২)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন। (তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন)

তাহাজ্জুদের নামায

পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আগে ইসলামের প্রথম যুগে তাহাজ্জুদের নামায রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সমগ্র উম্মতের ওপর ফরয ছিল। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)

অর্থ : হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধরাত্রি অথবা তদাপেক্ষা কিছু কম অথবা তদাপেক্ষা বেশি এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (সূরা মুযযাম্মিল : ১-৪)

এই আদেশ পালনার্থে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যয় করতেন, ফলে তাদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ দিবা-রাত্রি পরিমাপ করেন, তিনি জানেন তোমরা এর হিসাব রাখতে পারবে না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি করো। (সূরা মুযযাম্মিল-২০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মেরাজের রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এর পরও তাহাজ্জুদের সুন্নাত থেকে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। (তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন)

দীর্ঘ কেরাত ও রুকু-সিজদা :

তাহাজ্জুদের নামায ফরয থেকে নফল হওয়া সত্ত্বেও নবীজি (সা.) দীর্ঘ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। রাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন আবার উঠে নামাযে দাঁড়াতেন। এভাবে তিনি রাত কাটাতেন। লম্বা থেকে লম্বা কেরাত পড়তেন। দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকতেন। দীর্ঘ সিজদা করতেন। কওমা জলসায়ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু'আয় মশগুল থাকতেন। আবার কখনো একটি আয়াত তিলাওয়াত করে রাত পার করে দিতেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে তাঁর পা মুবারক ফুলে গিয়েছিল। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? আপনার তো আগে-পরের সব গোনাহই মাফ করে দেওয়া হয়েছে। উত্তরে নবীজি (সা.) বললেন, আমি কি শোকরগোজার বান্দা হব না?

أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ، يَقُولُ :قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ :غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ :أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (بخارى رقم الحديث ٤٨٣٦)

নবীজি (সা.)-এর ভাষ্যমতে রাত্রের শেষভাগ হচ্ছে, মহান আল্লাহকে কাছে পেয়ে একান্তে কিছু চেয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি ইরশাদ করেন, মহান প্রভু প্রতি রাতের শেষ প্রহরে পৃথিবীর আসমানে আগমন করে বলেন, কে আছ আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ :مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي

فَأَغْفِرَ لَهُ "(متفق عليه)

প্রভুর সাথে সাক্ষাতের এমন মুহূর্তে নবীজি (সা.)-এর অবস্থা কেমন হতে পারে তার বিবরণ বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়।

একদা হযরত হুযাইফা (রা.) নবীজি (সা.)-এর তাহাজ্জুদের নামায পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন, নবীজি (সা.) নামায শুরু করে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করলেন এবং রুকুতে গেলেন। রুকু, কিয়ামের মতোই দীর্ঘ ছিল। সেখানে তিনি سبحان ربى العظيم পড়তে থাকেন। এরপর রুকু থেকে উঠে ওই পরিমাণ কিয়াম করলেন এবং বললেন لربى الحمد অতঃপর সিজদায় গেলেন এবং কিয়ামের মতো দীর্ঘ সিজদা করলেন। সেখানে তিনি سبحان ربى الاعلى পড়তে থাকলেন। এরপর সিজদা থেকে উঠে বসলেন এবং দুই সিজদার মাঝে ওই পরিমাণ বসলেন, এভাবে সূরা আল-বাকারা, আলে ইমরান, আন নিসা এবং আল-মায়েদা এই চারটি সূরা দিয়ে চার রাকাআত নামায আদায় করলেন। (আবু দাউদ)

জনৈক সাহাবী একবার মসজিদে নববীতে রাত্রি যাপন করেন। তিনি বলেন, নবীজি (সা.) তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন। আমারও শখ হলে নবীজি (সা.)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে নিয়্যাত বাঁধলাম। হুজুর (সা.) সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন। আমি মনে করলাম একশত আয়াত তিলাওয়াত করে হয়তো রুকু করবেন। কিন্তু যখন একশত পার হয়ে গেল, তখন মনে করলাম দুই শতে গিয়ে রুকু করবেন; কিন্তু করলেন না। আমি ভাবলাম হয়তো সূরা শেষ করেই ছাড়বেন। কিন্তু যখন সূরা শেষ হলো নবীজি (সা.) কয়েকবার اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد পড়ে সূরা আলে ইমরান আরম্ভ করলেন, আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভাবলাম এই সূরা শেষ করে অবশ্যই রুকুতে যাবেন। হুজুর (সা.) এই সূরা শেষ করে তিনবার اللهم لك الحمد পড়লেন এবং সূরা মায়েদা শুরু করলেন। এটা শেষ করে রুকুতে গেলেন। রুকুতে গিয়ে سبحان ربى العظيم পড়তে লাগলেন এবং সাথে আরো কিছু পড়লেন, যা বুঝতে পারিনি। এরপর সিজদায় গিয়ে سبحان ربى الاعلى পড়তে লাগলেন এবং সাথে আরো কিছু পড়লেন। এরপর দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা আন'আম শুরু করলেন। আমি হুজুর (সা.)-এর সাথে নামায পড়ার হিম্মত হারিয়ে ফেললাম এবং অপারগ হয়ে চলে এলাম।

প্রথম রাকাআতে প্রায় পাঁচ পারা তিলাওয়াত হয়েছে। আর হুজুর (সা.)-এর তিলাওয়াত ছিল শান্তভাবে ধীরগতির। তাজবীদ ও তারতীলের সাথে প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক তিলাওয়াত করতেন। কাজেই ভেবে দেখুন কত দীর্ঘ কিয়াম ছিল। এ কারণে তাঁর পা মুবারকে পানি এসে ফুলে যেত। কিন্তু যে জিনিসের মজা অন্তরে বসে যায়, তার জন্য কষ্ট করা সহজ হয়ে যায়। (ফাযায়েলে নামায)

হুজুর (সা.) অনেক সময় একটিমাত্র আয়াত তিলাওয়াতের মাঝে এমন মগ্ন হতেন যে সারা রাত কেটে যেত। হযরত আবু যর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযে দাঁড়ালেন এবং একটি আয়াত দিয়ে সারা রাত পার করে দিলেন। আয়াতটি হচ্ছে–

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ : যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (সূরা আল মায়েদাহ-১১৮)

سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ :قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةٍ، وَالْآيَةُ (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (السنن الكبرى للنسائى ١٠٨٤)

উক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর একটি উক্তি উল্লেখ হয়েছে। তিনি হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করে বলবেন, যদি আপনি আমার উম্মতকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনার গোলাম। মনিব নিজ গোলামকে শাস্তি দিলে কারো আপত্তি করার অধিকার থাকে না। আর যদি আপনি তাদের গোনাহ মাফ করে দেন তবুও তারা আপনারই গোলাম।

ইবনে কাসীর (রহ.) হযরত আবু যর (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) একবার সারা রাত ان تعذبهم فانهم عبادك আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ আয়াতটিই পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকু করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারাই সিজদা করেছেন। তিনি বললেন, আমি পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের জন্য শাফায়াতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাভ করব। আমি এমন ব্যক্তির জন্য শাফায়াত করতে পারব যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো অংশীদার করেনি।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, মহানবী (সা.) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন এবং বলেন, اللهم امتى হে পাক পরওয়ারদেগার! আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরোক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন, তাহলে যাও এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বলে

দাও যে, আমি অতি সত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব, অসন্তুষ্ট করব না। (তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন)

সফরে তাহাজ্জুদের পাবন্দি

সফরে থাকাকালীনও নবীজি (সা.)-এর এই আমল বহাল থাকত। তাহাজ্জুদের মাধ্যমে মনিবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে রাত্রি জাগরণের অভ্যাসে ব্যত্যয় ঘটত না। হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহানী (রা.) কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাহাজ্জুদের নামায কিভাবে আদায় করেন আমি তা অবলোকন করার ইচছা করলাম। দেখলাম তিনি এশার নামায পড়ে বেশকিছু সময় শুয়ে রইলেন। এরপর জাগ্রত হয়ে দিগন্ত পানে তাকিয়ে

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤)

(সূরা আলে ইমরান : ১৯০-১৯৪) আয়াতগুলো পড়লেন। এরপর বিছানার নিচ থেকে মেসওয়াক বের করে মেসওয়াক করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আনুমানিক যতক্ষণ শুয়েছিলেন ওই পরিমাণ সময় নামায পড়লেন। এরপর আবার শুইলেন এবং আনুমানিক যতক্ষণ নামায পড়েছিলেন ওই পরিমাণ শুয়ে থাকলেন। অতঃপর উঠলেন এবং পূর্বের ন্যায় সব কাজ করলেন। নামায শেষ করে আবার শুয়ে পড়লেন। ফজর পর্যন্ত এভাবে তিনবার করলেন। (নাসাঈ শরীফ)

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَاللَّهِ لَأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةٍ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ، اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأُفُقِ، فَقَالَ " :(رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا) (آل عمران١٩١) حَتَّى بَلَغَ (إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (آل عمران١٩٤) ، ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا، ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ :قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ :قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ (نسائى رقم الحديث ١٦٢٦)

বার্ধক্যে তাহাজ্জুদের পাবন্দি

ওফাতের এক বছর পূর্বে নবীজি (সা.) শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। পূর্বের ন্যায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ পড়ার মতো সক্ষমতা আর বাকি রইল না। তবে দাঁড়ানোর পরিবর্তে তখন বসে বসে নফল আদায় করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বয়সজনিত কারণে দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন অধিকাংশ নামায বসে আদায় করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَقُلَ، كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا(مسلم رقم الحديث ([٧٣٢]١١٧

ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন :

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায শেষে মসজিদে বসে থাকে এবং দুনিয়াবী কোনো কথা না বলে, অতঃপর ইশরাকের দুই রাকআত নামায আদায় করে, তার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ(ابوداود ١٢٨٧)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকআত পড়ে নাও, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ :ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ (ترمذى ٤٧٥)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চাশতের বারো রাকআত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করবেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ (ترمذى ٤٧٣)

হযরত উম্মে হানী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফাতহে মাক্কার দিন তাঁর গৃহে আসেন এবং গোসল করে আট রাকআত নফল পড়েন। আমি এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত নামায পড়তে তাঁকে কখনো দেখিনি। তবে রুকু-সিজদা যথারীতি আদায় করতেন।

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (بخارى ١١٧٦)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর কোনোরূপ দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলে ছয় রাকআত আদায় করবে তাহলে এর পরিবর্তে তাকে বারো বছর ইবাদতের সাওয়াব দান করা হবে।

অপর হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকআত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন।

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

وفي رواية مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (ترمذى ٤٣٥)

যেকোনো বিপদে নামায

নামায আল্লাহ তা'আলার বড় রহমত, তাই যেকোনো বিপদে নামায পড়ে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার শিক্ষা পবিত্র সীরাতে বিদ্যমান। নবীজি (সা.) কোনো পেরেশানিতে পতিত হলে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

অর্থ : তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন, তবে বিনয়ী লোকদের পক্ষে তা সম্ভব। (সূরা বাকারা-৪৫)

হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى (ابو داود ١٣١٩)

অর্থ : হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে যখন কোনো বিপদ আসত তখন সাথে সাথে তিনি নামাযে মনোযোগী হতেন। (আহমদ, আবু দাউদ)

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, ঝড়-তুফান শুরু হলে হুজুর (সা.) তৎক্ষণাৎ মসজিদে তাশরীফ রাখতেন এবং ঝড় বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের হতেন না। তদ্রুপ চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের সময় নবীজি (সা.) নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

হযরত নযর (রা.) বলেন, একবার দিনের বেলা আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে হযরত আনাস (রা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর (সা.)-এর যুগে কখনো এমন পরিস্থিতি হয়েছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পানাহ, হুজুর (সা.)-এর যমানায় তো বাতাস সামান্য জোরে বইতে শুরু করলে আমরা কেয়ামতের ভয়ে মসজিদে দৌড়ে আসতাম। (আবু দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, নবীজি (সা.)-এর পরিবারে কখনো অভাব দেখা দিলে তিনি সকলকে নামাযের কথা বলতেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

অর্থ : আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দিই এবং আল্লাহর ভীরুতার পরিনাম শুভ। (সূরা ত্বহা-১৩২)

রণাঙ্গনে নামায :

আবাসে বা প্রবাসে, ঘর বা সফরে, নিরাপদে বা আতঙ্কে, শান্তিতে বা যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বাবস্থায় নামাযের বিধান বলৎ থাকে। বরং প্রতিকূল অবস্থায় এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। যেহেতু বিপদ মুক্তির মাধ্যমও এই নামায। তাই পবিত্র সীরাতে পরতে পরতে নামাযের বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বদর প্রান্তরে যখন মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনী এক প্রকার নিরস্ত্র অবস্থায় শক্তিশালী কাফের বাহিনীর মুখামুখি হলো, তখন আল্লাহর সাহায্য কামনায় নবীজি (সা.) যেভাবে নামায আর দুআ, মোনাজাত করে ছিলেন, তা মুসলিম সেনাপতিদের জন্য কেয়ামত অবধি শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমাদের মাঝে মেকদাদ (রা.) ছাড়া কারো কাছে কোনো বাহন ছিল না। রাতে আমরা সকলে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু নবীজি (সা.) সারা রাত একটি বৃক্ষের নিচে নামায পড়তে লাগলেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন। (হায়াতুস সাহাবা, তারগীব-১/৩১৬)

এত ছিল যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান কালের বিবরণ, তখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি। উভয় বাহিনী যার যার অবস্থানে রাত্রি যাপন করা কালীন নবীজি (সা.) এ সকল আমল করে ছিলেন। অন্য ঘটনায় শত্রুর মুখামুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে নামায আদায়ের বিবরণও পাওয়া যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে উসফান নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। আমাদের সামনে মুশরিক বাহিনী চলে এল, তাদের সেনাপতি ছিল খালেদ বিন ওয়ালিদ। আমাদের মাঝে আর কেবলার মাঝে ছিল মুশরিকদের অবস্থান। নবীজি (সা.) এমন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সকলকে নিয়ে জোহরের নামায আদায় করলেন। কাফেররা বলাবলি করতে লাগল, মুসলামানদের মারার একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। আমরা চাইলে তাদেরকে নামাযের মধ্যে হত্যা করে দিতে পারতাম। পরক্ষণে আবার তারা বলল যে, একটু পরে আবার মুসলমানদের সামনে এমন এক নামাযের ওয়াক্ত আসছে, যা তাদের কাছে নিজেদের জান এবং সন্তানাদি অপেক্ষা প্রিয়। অর্থাৎ মুশরিক বাহিনী পরবর্তী

নামায আসরের জামাআতে হামলা করার অপেক্ষায় রইল। ইতিমধ্যে হযরত জিব্রাঈল (আ.) জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে সালাতুল খওফের বিধান নিয়ে আগমন করলেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

অর্থ : যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন, আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে তোমরা কোনোরূপ অসতর্ক থাকো, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরক আক্রমণ করে বসে।

(আন নিসা-১০২)

জামাআতের সাথে নামায :

নবীজি (সা.) যেভাবে নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, অনুরূপ পুরুষদের ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করার ওপরও জোড় তাগিদ দিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (متفق عليه)

নবীজি (সা.) বলেন, একা নামায অপেক্ষা জামাআতের নামাযের ফযীলত সাতাশ গুণ বেশি।

অপরদিকে জামাআতের নামায ছেড়ে দেওয়ার পরিণতির কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনল এবং কোনো ওজর ছাড়াই জামাআতে হাজির হলো না। একাকী পড়ে নিল। তার নামায কবুল হবে না।

(আবু দাউদ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ (نسائى رقم الحديث ٧٩٣)

আল্লাহর রাসূল (সা.) একবার মদীনা শরীফের বাইরে থেকে তাশরীফ আনলেন, মসজিদে গিয়ে দেখলেন জামাআত শেষ হয়ে গেছে। তিনি ঘরে ফিরে এলেন এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করলেন। (তাবরানী)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحى المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم

জীবন সায়াহ্নে নামাযের গুরুত্ব :

আল্লাহর হাবীব (সা.) ওয়াফাতের পূর্বে বারো/তেরো দিন রোগাক্রান্ত ছিলেন। সফর মাসের শেষ বুধবার তিনি জান্নাতুল বাকী কবরস্থান হতে ফিরে হযরত মায়মুনা (রা.)-এর গৃহে প্রবেশের পর হতে অসুস্থতা অনুভব করতে লাগলেন। সামান্য সমান্য জ্বর এবং মাথাব্যথা দিয়ে এর সূচনা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। অবশেষে এই রোগেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। অসুস্থ অবস্থায় তিনি নিজেই যথারীতি নামাযের ইমামতি করতে থাকেন, এভাবে এক সপ্তাহ চলে যায়। এর পরের বুধবার মাগরিবের নামাযে তিনি সর্বশেষ ইমামতি করেন। এরপর থেকে মসজিদে যেতে অক্ষম হয়ে পড়েন, ফলে হযরত আবু বকরকে (রা.) ইমাম নিযুক্ত করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি একদিন মাগরিবের নামাযে 'ওয়াল মুরসালাত' সূরা পাঠ করলাম। এটা শুনে আমার মাতা উম্মুল ফযল বললেন, তুমি এই সূরা পাঠ করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে এই সূরাটিই আমি মাগরিবের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখে শেষবার শুনে ছিলাম। তিনি এরপর আর নামায পড়াননি।

(বোখারী-২/৬৩৭)

এটা ছিল ইন্তেকালের ছয় দিন পূর্বে বুধবারের মাগরিবের নামায। এদিন এশার নামাযে যাওয়ার জন্য তিন-তিনবার গোসল করে প্রস্তুতি নিয়েও অক্ষম হন এবং আবু বকরকে (রা.) ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখন নবীজি (সা.)-এর পীড়া তীব্রতর অবস্থা ধারণ করে, তখন তিনি (এশার নামাযের সময়) আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, মসজিদে নামায হয়ে গেছে কি? আমরা বললাম, হয়নি। সকলেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এ কথা শুনে তিনি এক গামলা পানি আনিয়ে গোসল করলেন, এরপর উঠে দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। চেতনাপ্রাপ্ত হওয়ার পর আবারো একই কথা জানতে চাইলেন, আমরাও একই উত্তর দিলাম। তিনি আবার পানি আনিয়ে গোসল করে ওঠার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। এরূপ তিনবার গোসল করলেন, প্রত্যেকবার ওঠার চেষ্টা করলে অচেতন হয়ে পড়তেন এবং চেতনা ফিরলে অনুরূপ প্রশ্ন করতেন। আমরাও একই উত্তর দিতাম। শেষবার চেতনা ফিরে এলে তিনি বললেন, আবু বকরকে নামাযের ইমামতি করতে বলো। হযরত আবু বকর ছিলেন অতি কোমল হৃদয়ের মানুষ। তাঁর কাছে এই খবর পৌঁছলে তিনি উমরকে বললেন, আপনি নামায

পড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, আপনিই এই কাজের জন্য সমধিক উপযোগী। তখন হযরত আবু বকর (রা.) ইমামতি করতে আরম্ভ করেন।

(সহীহুল বোখারী-১/৯৯)

এমন কঠিন পীড়াবস্থায়ও নবীজি (সা.) জামাআতের সাথে নামায আদায়ের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালালেন। কিন্তু তাঁর শরীর মোবারক আর সায় দিল না। পরের দিন বৃহস্পতিবার। জোহরের নামাযের সময় ঘনিয়ে এলো। নবীজি (সা.) কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কানায় কানায় ভরা সাত মশক পানি আমার ওপর ঢালো। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমরা পানি ঢালতে আরম্ভ করলাম। তিনি যখন হাতের ইশারায় ক্ষান্ত হতে নির্দেশ দিলেন, তখন আমরা পানি ঢালা বন্ধ করলাম। এরপর তিনি হযরত আব্বাস ও আলীর কাঁধে ভর করে মসজিদে গেলেন। তিনি পায়ের ওপর মোটেই ভর করতে পারছিলেন না। মাটির ওপর তাঁর পদদ্বয় হেঁচড়ে যাচ্ছিল।

তখন মসজিদে জামাআত চলছিল, হযরত আবু বকর নামাযে ইমামতি করছিলেন। নবীজি (সা.)-এর আগমন বুঝতে পেরে তিনি পেছনে সরে আসতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ইশারায় নিষেধ করলেন। তাঁরা দুজন নবীজিকে (সা.) ধরে আবু বকর (রা.)-এর বাম পার্শ্বে বসিয়ে দিলেন। তিনি বসে বসে নামায পড়লেন। হযরত আবু বকর তাঁর মুক্তাদি হলেন এবং দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। অন্য বর্ণনা মতে, হযরত আবু বকর মুকাব্বির হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাকবীর ধ্বনি উচ্চস্বরে লোকদের শোনাচ্ছিলেন।

(সহীহুল বোখারী ও মুসলিম)

এই ছিল আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর জীবনে নামায আর জামাআতের গুরুত্ব। দেহে প্রাণ থাকাবস্থায় জামাআতে নামায আদায় করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। সর্বশেষ দুজনের কাঁধে ভর করে মসজিদে তাশরীফ এনেছেন। মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়েও বারবার চেষ্টা করেছেন জামাআতে শরীক হতে।

উম্মতকে নামাযের কাতারে দেখে গেলেন :

বৃহস্পতিবার জোহরে নবীজি (সা.) জামাআতে শরীক হওয়ার পর সাহাবাদের মাঝে আবার প্রতীক্ষার প্রহর গোনা শুরু হয়। এই বুঝি নবীজি (সা.) বের হয়ে আসছেন। কিন্তু না, তিনি আর আসতে সক্ষম হলেন না। এভাবে কেটে গেল আরো তিনটি দিন।

এলো সোমবার। নবীজি (সা.)-এর জীবনের শেষবার। ফযরের আযান হতেই সাহাবীগণ মসজিদে সমবেত হতে লাগলেন। সকলের দৃষ্টি হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরার প্রতি। নবীজি (সা.)-কে দেখার জন্য সকলের মন উতলা হয়ে আছে, কখন তিনি তাশরীফ রাখবেন। হযরত আবু বকর (রা.) অগ্রসর হয়ে নামায পড়াতে আরম্ভ করলেন।

প্রভাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছুটা স্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। হুজরার পর্দা সরিয়ে তিনি মসজিদের দিকে তাকালেন। নীরব দৃষ্টি মেলে নামাযরত সাহাবীদের দেখতে লাগলেন। একটা স্বর্গীয় প্রশান্তির ছাপ চোখেমুখে ফুটে উঠল। তাঁর চির বিদায়ের পর মুসলমানগণ কিরূপে নামায পড়বে, কিরূপে অন্যান্য ধর্মকর্ম করবে, তার বাস্তবরূপ আজ তিনি দেখতে পেলেন। এক নতুন উম্মতের অভ্যুত্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। অনাগত ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল চিত্র দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন। নামাযের কাতারে উম্মতকে শেষ দেখা দেখলেন।

নামাযরত সাহবীগণ পর্দা সরানোর শব্দ শুনে ভাবলেন, জামাআতে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ (সা.) বুঝি তাশরীফ নিয়ে আসছেন। আনন্দে তাঁরা আত্মহারা হয়ে পড়লেন। এমনকি তাঁদের নামায ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো। হযরত আবু বকর (রা.) ইমামের স্থান ছেড়ে পশ্চাৎপদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হাতের ইশারায়ে তাঁকে নিষেধ করে দিলেন এবং পর্দা টেনে হুজরার ভেতর প্রবেশ করলেন।

(সহীহুল বোখারী ও মুসলিম)

শেষ অসিয়ত নামায নামায :

সোমবার বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রম করে গেছে। শেষ বিদায়ের সময় আসন্ন প্রায়। এমন সময় হযরত আবু বকরের পুত্র হযরত আব্দুর রহমান (রা.) মেসওয়াক হাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হুজরায় প্রবেশ করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) স্বামীর পবিত্র মস্তক কোলে নিয়ে বসে আছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আব্দুর রহমানের হাতের মিসওয়াকের দিকে সতৃপ্ত নয়নে তাকিয়ে রইলেন। চিরদিন তিনি মিসওয়াক করতে ভালোবাসতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মিসওয়াক করতে চান? তিনি মাথার ইশারায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে সুস্থ মানুষের মতো মিসওয়াক করলেন।

এরপর হঠাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তাঁর বুকের ভেতরটা গড়গড় করতে আরম্ভ করল। নিকটেই পানির পাত্র রাখা ছিল। তিনি বার বার তাতে হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতে লাগলেন। তাঁর মাঝে একটা অবসাদ দেখা দিল, নিস্তেজ হয়ে পড়লেন, ঠোঁটদ্বয় নড়তে লাগল। বিড়বিড় করে কিছু বলছেন। লোকেরা শুনতে পেল, তিনি বলছেন, নামায নামায এবং ক্রীতদাস। এরপর তিনবার বললেন, بل الرفيق الاعلى আর কিছু চাই না শুধু পরম বন্ধুর মিলন চাই। এই বলে তিনি আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম হতে শেষ বিদায় গ্রহণ করলেন।

(সহীহুল বোখারী, যাদুল মা'আদ দালায়েলুন নবুওয়্যাহ)

নগরায়ণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগান্তকারী পরিকল্পনা

মুফতী মাহমুদ হাসান

হিজরতের নির্দেশের সাথে সাথে মদীনায় মুহাজিরগণের ঢল নামল। একপর্যায়ে মদীনার স্থায়ী বাসিন্দাদের চেয়ে মুহাজিরগণের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে গেল। নবাগতদের আবাসন নিশ্চিত করতে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম দিন থেকেই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এই পরিকল্পনার বিশ্লেষণধর্মী পাঠের পর এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দ শ বছর পূর্বে নগর পরিকল্পনা ও নগরায়ণনীতি বিষয়ক তিনি কী অবিশ্বাস্য বিপ্লব সাধন করেছিলেন। নবাগতদের এত বিশালসংখক মুসলিমকে সীমিত উপকরণের মধ্যে বসবাস ও উপার্জনের ব্যবস্থা করা সহজ বিষয় ছিল না। তা ছাড়া বিভিন্ন বংশ, স্তর, এলাকা ও বিভিন্ন সভ্যতার বাহক এই বৈচিত্র্যময় নবাগত মুহাজিরগণকে এমনভাবে প্রত্যাবাসন করা, যেন তাদের মধ্যে পরদেশি ভাবও না থাকে এবং মদীনার পরিবেশে কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বা আইন-শৃঙ্খলায় কোনো বিঘ্ন না হয়। সাধারণত এ ধরনের পরিস্থিতিতে যা হয়ে থাকে। এটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন্ত এমন একটি অলৌকিক কীর্তি, যা নগর বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদদের জন্য বিশেষ পাঠ ও গবেষণার দাবি রাখে। আধুনিক শহরগুলোতে নাগরিকগণের সামাজিক, শিষ্টাচার ও রাজনৈতিক বিভিন্ন জটিলতার সমাধানে বিশেষজ্ঞগণ আজও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থা থেকে অনেক কিছু অর্জন করতে পারে।

সর্বপ্রথম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই পৃথিবীর সামনে এই রহস্য উন্মোচন করেছেন যে, শুধু ইট-পাথরের দালানের মাঝে চিকন গলি আর মার্কেট বানিয়ে দেওয়ার নামই শহর নয়। বরং এর সাথে এমন সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ব্যবস্থাও অপরিহার্য, যাতে শারীরিক-মানসিক সজীবতা এবং দ্বীনি ও আন্তরিক প্রশান্তির মাধ্যমে উচ্চমার্গের মানবিকতা ও মানবসভ্যতার উত্তরণ ও বিকাশ সাধিত হয়।

মদীনা নগরীর প্রাথমিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

প্রাথমিকভাবে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই রাষ্ট্র পরিচালনা ভবন তৈরির জায়গা নির্বাচন ও এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্বেই জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শুরুতেই মসজিদে নববী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে এর প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত কার্যের মূল কেন্দ্র মসজিদে নববীই ছিল। আর দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয় নবাগত মুহাজিরগণের আবাসনের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঘর নির্মাণের মাধ্যমে। নির্মাণাদির এই স্তর ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে বছরখানেক বা এর চেয়ে কিছু সময় কেটে যায়। (তারীখে ইবনে কাসীর, ৩/২২০-২২২)

মদীনা নগরী এক বিবেচনায় মুহাজির শিবির ছিল। যদিও সকল মুহাজির মদীনাতেই ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই মদীনা নগর বিস্তৃত হয়ে আশপাশের বসতিগুলো যথা বনু সায়োদা ও বনু নাজ্জারের সাথে লেগে যায়। যদিও নগর পলিসি ছিল যে, মদীনাতে কেবলমাত্র মুহাজিরগণই থাকবেন। এ জন্যই পার্শ্ববর্তী গোত্র বনু সালামা যখন মদীনায় এসে বসতি স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিজেদের কলোনিতে থাকার নির্দেশ দিয়ে মদীনায় বসত গড়ার প্রতি নিরুৎসাহিত করেছিলেন। (দেখুন : সহীহ বোখারী, হা. ১৮৮৭)

মদীনা নগরীর পলিসির মধ্যে এটিও একটি ছিল যে, আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে বসতভিটা ছেড়ে আসা অসহায় মুহাজিরগণের আবাসন সরকারিভাবে ব্যবস্থা করা। তাই প্রাথমিকভাবে বসবাসের জন্য মসজিদে বা মসজিদের চবুতরায় ব্যবস্থা করা হতো, আর বড় গোত্র হলে শহরের এক পাশে বিশাল তাঁবুর ব্যবস্থা করা হতো। আর তাদের প্রাথমিক খানার জন্য সরকারিভাবে মেহমানদারির ব্যবস্থা হতো। প্রাথমিক পর্ব শেষে ধীরে ধীরে স্থায়ী আবাসন ও রোজগারের ব্যবস্থা করা হতো। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১/৩৪৬, ওয়াফাউল ওয়াফা ১/৫২৫)

স্থায়ী আবাসনের উদ্যোগ

স্থায়ী আবাসনের জন্য সাধারণত দুটি ব্যবস্থা করা হতো :

এক. কোনো ধনী আনসারকে দায়িত্ব দেওয়া হতো যে, তিনি যেন একজন মুহাজির ভাইয়ের স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করেন। তবে স্মর্তব্য যে, এ ব্যবস্থাটি দীর্ঘস্থায়ী ছিল না, বরং প্রাথমিকভাবে মদীনা রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্তই ছিল।

দুই. দ্বিতীয় ব্যবস্থাপনা ছিল রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনাবাদ জায়গাগুলো আবাদ করার মাধ্যমে অথবা কতেক আনসারী সাহাবীর দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জমিতে মুহাজিরগণের জন্য বড় বড় ঘর তৈরি করা হতো। এই ঘরগুলো বড় বড় কামরাবিশিষ্ট ছিল। একেক ঘর একেক গোত্রকে দেওয়া হতো। তবে রান্নাবান্নার জায়গা গোত্রভিত্তিক একত্রে ছিল। (তারীখে ইবনে কাসীর, ৩/২২৪-২২৯, ওয়াফাউল ওয়াফা, ১/৫২৭)

মদীনা শহরের বিস্তৃতির সাথে পরিকল্পনার পটপরিবর্তন

নববী যুগের শেষের দিকেই মদীনা নগরী পশ্চিমে বুত্হা পর্যন্ত, পূর্বে বাক্বী ও উত্তর পূর্বে বনু সায়োদা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নতুন বাসস্থান স্থাপনে নিরুৎসাহিত করেন। যদিও ধীরে ধীরে আরো কিছু সীমানা বিস্তৃত হয়, তবে মৌলিকভাবে তা নিয়ন্ত্রণে সফল হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যখন মদীনার বসতি 'সিলা পাহাড়' পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন তোমরা শামের দিকে হিজরত করবে।" (ওয়াফাউল ওয়াফা ১/৯৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পদক্ষেপটি নগর পরিকল্পনায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর গুরুত্ব ওই ব্যক্তিই বুঝতে পারবে, যে বর্তমানের শৈল্পিক শহরগুলোর কপট চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে কাছ থেকে উপলব্ধি করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শহরকে বিশেষ সীমা থেকে বাড়তে দেননি। এ নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি নিম্নোক্ত তিনটি পথ অবলম্বন করেন :

১. যাদের পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় আবাসন সংকট তৈরি হয়, তাদেরকে উপরের দিকে তলা বাড়িয়ে একাধিক তলাবিশিষ্ট ঘর বানানোর নির্দেশ দেন। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) তাঁর ঘরের সংকীর্ণতার সমস্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলে তিনি বললেন,

"ارفع البناء في السماء ، وسل الله عز وجل السعة "

"তুমি উপরের দিকে ঘর উঠাও, আর আল্লাহর কাছে সামথ্য কামনা করো।" (আখবারু মাক্কা ৩/৩০৪)

২. অতিরিক্ত বসতিকে নতুন খালি স্থানে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে দুটি উপকার হয়েছে। এক হলো, এতে কৃষি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, নবাগতদের আবাসনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা হয়েছে।

৩. বনু কুরাইযা ও বনু নযীরের বিজিত এলাকাসহ মদীনার অভ্যন্তরীণ অন্য জায়গাগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যাতে একদিকে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়, অন্যদিকে গোত্র ও শ্রেণিগত সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ গড়া যায়। (বোখারী, হা. ৪০২৮, ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৩১)

এতে কোনো অতিশয়তা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ব-উদ্দেশ্যে অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে কিছু পশ্চিমা দেশ এসব সোনালি নীতি অনুসরণ করেই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলা দূরীকরণে এক প্রকার সফল হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাড়ে চৌদ্দ শ বছর পূর্বেই আমল করে দেখিয়েছিলেন।

মদীনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ

মদীনা শরীফের নগর রাষ্ট্র দশ বছরের চেয়েও কম সময়ে উন্নতির ধাপসমূহ পেরিয়ে এক বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যার রাজত্বের সীমা উত্তরে ইরাক ও শামের সীমান্ত থেকে নিয়ে দক্ষিণে ইয়েমেন ও হাযরামাউত পর্যন্ত, পশ্চিমে লোহিত সাগর থেকে নিয়ে পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ইরান রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যার পরিমাপ হলো প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল।

যদিও পূর্ব থেকেই মদীনা শহরের নিয়ম-রীতি আরবের প্রাচীন নিয়ম অনুসারে গোত্রভিত্তিক নেতৃত্বাধীন ছিল। কিন্তু দ্রুতই তা একটি সর্বব্যাপী ও কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতার রূপ নিল। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি জীবন্ত মুজিযা যে এ বিচ্ছিন্ন একটি জাতিকে নিপুণভাবে একটি জাতিসত্তায় পরিণত করলেন। এটি আরবদের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল। কেননা তারা বিভিন্ন গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল। ফলে বিভিন্ন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর যখন সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন, তখন মদীনায় বিভিন্ন ধর্ম ও

গোত্রের লোকের বসবাস ছিল। তাদের মধ্যে প্রধান দুটি গোত্র ছিল আউস ও খাযরাজ। বনু কাইনুকা, বনু নাজীর ও বনু কুরাইজা নামক ইহুদি গোত্ররাও তখন মদীনা এলাকায় বসবাসরত ছিল। এ ছাড়া আরো দু-চারটি উপদলও ছিল। ইসলামপূর্ব সময়ে মদীনার প্রধান দুটি গোত্র আউস ও খাযরাজের মাঝে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। এ দুটি গোত্রের প্রায় সকলেই যখন ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হলো, তখন তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। এহেন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিম্নের সমস্যাগুলো তাৎক্ষণিক সমাধানের প্রয়োজন ছিল :

ক. নিজের সাথীবর্গ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দায়িত্ব ও অধিকার চিহ্নিতকরণ।

খ. মুহাজিরগণের আবাসন ও জীবনযাপনের যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা।

গ. শহরের অমুসলিম বিশেষত ইহুদিদের সাথে সমঝোতা।

ঘ. শহরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রতিরক্ষার গুরুত্ব দেওয়া।

ঙ. মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত মুহাজিরগণের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা।

উপরোক্ত লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মীয় ও গোত্রগত সম্প্রদায়ের জনগণের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে সকলকে একটি চুক্তির আওতায় নিয়ে এলেন। ইতিহাসে যা 'মদীনা চুক্তি' বা 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত। মদীনা সনদের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় ইতিহাস ও সীরাতের বিভিন্ন কিতাবে। অবশ্য এর কিছু কিছু ধারা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। আবার সীরাত ও ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনায় কিছু কমবেশিও রয়েছে। এগুলোকে একত্রিত করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. জিয়া আলউমরী তাঁর 'আল মুজতামাউল মাদানী' কিতাবে। সেখানে তিনি এ চুক্তির বর্ণনাসূত্র নিয়ে গবেষণার সারমর্মও পেশ করেছেন। মদীনা সনদ ও সংশ্লিষ্ট আলোচনার জন্য দেখুন কিতাবটির ১০৭ থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠা।

মদীনা চুক্তির মূল কথাগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. এটি ছিল মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সম্পাদিত একটি চুক্তি। মদীনায় বসবাসকারী প্রায় সকল ধর্ম-গোত্রের মানুষকে এ চুক্তির অধীনে আনা হয়।

২. এ ভৌগোলিক সীমায় বসবাসকারী লোকজন একই দেশে বসবাসকারী নাগরিক বলে গণ্য হবে।

৩. চুক্তির আওতাভুক্ত লোকজন যে, যে ধর্মেরই হোক একে অন্য থেকে জানমালের নিরাপত্তা পাবে (যতক্ষণ না সে চুক্তি ভঙ্গ করে)।

৪. ফেতনা-ফ্যাসাদকে শক্ত হাতে দমন করা হবে।

৫. বহিঃশক্তি ও বহিরাগত হামলাকে সকলে মিলে প্রতিহত করবে।

৬. কোনো বিষয়ে বিরোধ পরিলক্ষিত হলে তার ফয়সালা করবেন আল্লাহ ও তার রাসূল, অর্থাৎ কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী তা মীমাংসিত হবে।

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত কেউ যুদ্ধে বের হবে না। (মাজমূআতুল ওয়াছাইকিছ সিয়াসিয়্যাহ লিল আহদিন নববী ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ, ড. হামীদুল্লাহ পৃ. ৬১, ৬২; আল মুজতামাউল মাদানী ফী আহদিন নুবুওয়াহ, ড. আকরাম জিয়া আল-উমারী পৃ. ১২১, ১২২)

এ ছাড়া উক্ত চুক্তিতে নগরায়ণের পলিসি হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে :

এক. শান্তি প্রতিষ্ঠা।

দুই. শিক্ষা ও দীক্ষার প্রচার ও সহজীকরণ।

তিন. আবাসন, আয়-রোজগার ও অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা।

নগরায়ণে বিভিন্ন উদ্যোগগ্রহণ

বর্তমানে আধুনিক নগরায়ণে সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয় :

১. শহরের রাস্তা ও সড়ক, মার্কেট নির্মাণ এবং আবাসন ব্যবস্থা।

২. বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা ও বণ্টন।

৩. ব্যবহৃত পানির নিষ্কাশন ও ময়লা-আবর্জনার ডাস্টবিনের ব্যবস্থা ও তার পরিচ্ছন্নতা।

৪. শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্যান্য সেবামূলক সংস্থাসমূহ ও খেলাধুলার ব্যবস্থা।

৫. শহরের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন।

৬. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি।

উক্ত সকল বিষয়ের ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রাষ্ট্র পরিচালনা জীবনে দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। বিশেষভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি পয়েন্টের ওপরই স্তরমাফিক বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আমরা এ স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সবগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করতে পারব না এবং এখানে

তার প্রয়োজনও নেই। তাই সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বিষয়ে আলোচনা করছি।

শিক্ষা সম্প্রসারণ ও চিকিৎসাব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষা সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। বিভিন্ন গোত্রভিত্তিক পাঠশালা তৈরি করে সেখানে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ দিতেন। যাঁরা তাদেরকে কোরআন-সুন্নাহ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেন, দ্বীনি দাওয়াত সম্প্রসারণ করতেন। (দেখুন : সহীহ বোখারী, হা. ১০০২, ১৩৯৫, ৪৩৪১, ৪৩৪৯)

মসজিদে নববীর চবুতরায় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তা ছিল একটি উন্মুক্ত পাঠশালা। সেখানে বিশেষ করে অসহায় ও পরদেশি মুসলিমদের জন্য ধনী সাহাবীগণের অর্থায়নে খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হতো। (সহীহ বোখারী, হা. ৪৪২, ৬০২, ৬৪৫২)

এ ছাড়া ইমাম বোখারী (রহ.) তাঁর সহীহ বোখারীতে মসজিদে অসুস্থদের সেবার জন্য স্বতন্ত্র তাঁবু নির্মাণের বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদও উল্লেখ করেন। (দেখুন : বোখারী, হা. ৪৬৩)

বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা

মদীনার মানুষদের ব্যাপকভাবে খাবার পানির জন্য জনৈক ইহুদি থেকে 'রূমা' নামক কূপটি খরিদ করে তা প্রশস্ত করে খনন করা প্রয়োজন হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি 'রূমা' নামক কূপটি খনন করবে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। হজরত উসমান (রা.) তা শুনে 'রূমা' নামক কূপটি খরিদ করে তা প্রশস্ত করে খনন করে জনসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। (সহীহ বোখারী, হা. ২৭৭৮)

হজরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, তাঁর ঈসালে সাওয়াবের জন্য কোন সদকা উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "পানির ব্যবস্থা করা।" (সুনানে আবু দাউদ ১৬৮১, নাসাঈ ৩৬৬৪)

এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকায় সাহাবীগণ কূপ খনন করেন, সীরাতের কিতাবসমূহে যার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

শহরের রাস্তা ও সড়ক ব্যবস্থাপনা

শহরের মধ্যে অনেকে অন্যায়ভাবে রাস্তা দখল করে অবৈধ স্থাপনা ও কারবার আরম্ভ করে এবং এ নিয়ে বিশৃঙ্খলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে বলেন,

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيقِ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ

"তোমাদের মধ্যে যদি রাস্তা নিয়ে বিবাদ হয়, তাহলে তোমরা তার চওড়া (কমপক্ষে) ৭ হাত বা ৭ গজ রাখবে।" (সহীহ মুসলিম, হা. ১৬১৩)

সড়কের নিরাপত্তাবিষয়ক নির্দেশ হলো :

الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون -شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

"ঈমানের ৭৭টি শাখা রয়েছে, এর মধ্যে সর্বোচ্চ হলো লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিসসমূহ সরানো।" (সহীহ মুসলিম, হা. ৫৮)

অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له

"জনৈক ব্যক্তি পথ চলাকালীন পথিমধ্যে কাঁটাযুক্ত ডাল পেয়ে তা সরিয়ে রাখল, এতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" (সহীহ বোখারী, হা. ৬৫২)

মসজিদ ও কবরস্থান নির্মাণ

এলাকাভেদে প্রয়োজনীয় মসজিদ ও কবরস্থান নির্মাণ করেন। মদীনায় এসে শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণ করলেন। এর পাশেই 'বাক্বী' নামক স্থানে মুসলিমদের কবরস্থান গড়ে ওঠে। এ ছাড়া আশপাশের এলাকাগুলোতেও মসজিদ ও কবরস্থান গড়ে ওঠে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য মার্কেট নির্মাণ

মদীনার নাগরিকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহজলভ্যতার জন্য পূর্ব থেকেই চলে আসা বাজারের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন করে বাজার খুলে দিয়েছেন। এই বাজারের ব্যবসা সম্প্রসারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসামান্য প্রচেষ্টা করেন। পূর্ণ আরব উপদ্বীপ করায়ত্ত হওয়ার পর থেকে আমদানি-রপ্তানির কাজেও নতুন মাত্রা যোগ হয়। এমনকি এ ঘোষণা করে দিলেন যে মদীনার বাজারে ব্যবসায়ীদের জন্য ট্যাক্স নেই। (ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ২৪)

ব্যবসার প্রতি উৎসাহমূলক অনেক হাদীস রয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে, "সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ীগণ আখেরাতে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের

সাথে থাকবেন।" (তিরমিযী, হা. ১২০৯)

তাছাড়া বাজার পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে ১২ জনের কমিটি বানিয়ে দিলেন, যার প্রধান ছিলেন হজরত উমর (রা.)। (সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪৯১, আত্তারাতীবুল ইদারিয়্যা ১/২৮৪)

পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن اللـه طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا -أراه قال -أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি দয়াশীল, দয়াশীলতা পছন্দ করেন। তিনি দানশীল, দানশীলতা পছন্দ করেন। অতএব, তোমরা তোমাদের আঙিনাগুলো পরিষ্কার করো, ইহুদিদের মতো হইয়ো না।" (তিরমিযী, হা. ২৭৯৯, মুসনাদে আবী ইয়ালা, হা. ৭৯০)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা দুই অভিশাপকারী থেকে বেঁচে থাকো।" সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুই অভিশাপকারী কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

الذى يتخلى فى طريق الناس، أو فى ظلهم

যে মানুষের চলাচলের পথে অথবা মানুষের ছায়াগ্রহণের স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করে।" (সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৯)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى، ثم يغتسل فيه

"তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে, অতঃপর তা দিয়ে গোসল করে।" (সহীহ বোখারী, হা. ২৩৯, সহীহ মুসলিম, হা. ২৮২)

নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন

পরিবেশ সুন্দর করাও ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়হীন যেকোনো সুন্দরকে পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن الله جميل يحب الجمال

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নিজে সুন্দর, আর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।" (সহীহ মুসলিম, হা. ১৪৭)

মদীনায় ছিল অনেক সুন্দর দৃষ্টিনন্দন খেজুর বাগানসমূহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও গাছ লাগানোর প্রতি উৎসাহ দিতেন এবং অযথা গাছ কাটা ও পাতা ছেঁড়াকে নিষেধ করতেন। তিনি মাঝে মাঝে খেজুর বাগানে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন। মসজিদে নববীর সামনেই হজরত আবু তালহা (রা.)-এর বাইরুহা নামক একটি বাগান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝেমধ্যে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন, সেখানকার কূপ থেকে ঠাণ্ডা পানি পান করতেন। (বোখারী, হা. ১৪৬১)

বৈধ বিনোদন, শরীরচর্চার ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্লান্তি দূরকরণ, বিনোদন ও ঘোরাফেরার জন্য মদীনা শহরের অদূরে 'আকীক উপত্যকা'কে নির্ধারণ করেন। সেখানে বৃক্ষরোপণ করেন এবং পশু চরানোরও ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেও মাঝেমধ্যে আকীক উপত্যকায় গিয়ে আরাম করতেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৩/১৮৫)

মদীনার ছেলেরা বিভিন্ন মাঠ-প্রান্তরে বৈধ খেলাধুলা যথা শরীরচর্চা, দৌড় প্রতিযোগিতা, তরবারি চালনা, তীরান্দাজি ও ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করত। (দেখুন : আবু দাউদ, হা. ৪৭৭৩, ৫২০২) একদা এক দল ছেলে মসজিদে নববীর পাশে খোলা মাঠে তরবারি চালনা প্রতিযোগিতার খেলা করছিল। হযরত উমর (রা.) তা দেখে বাধা দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিষেধ করেছেন এবং ছেলেদেরকে খেলতে উৎসাহ দিলেন। (বোখারী, হা. ৯৮৮)

একদা বনু আসলামের লোকেরা তীরান্দাজি খেলছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, হে ইসমাঈলের বংশধররা! হ্যাঁ, তীর নিক্ষেপ করো, কেননা তোমাদের পিতাও দক্ষ তীরান্দাজ ছিলেন। (বোখারী, হা. ২৮৯৯)

এ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সীরাতের একটি অধ্যায় তথা নগর পরিকল্পনার সামান্য একটু বিবরণ। নচেৎ এ বিষয়টি স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। বর্তমানে শহরগুলোতে নাগরিকগণের সামাজিক, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও রাজনৈতিক বিভিন্ন জটিলতার সমাধানে বিশেষজ্ঞগণের আজও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থা থেকে নিকনির্দেশনা অর্জন করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

সময় বদলে দেয় জীবন

মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

দুনিয়াতে কত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, তা কে জানে! জন্মের পর তারা হাসে-কাঁদে, কিছুকাল সময় কাটায়। তারপর আল্লাহর হুকুমে একদিন দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। তাদেরকে আর কেউ মনে রাখে না। এটাই সাধারণ নিয়ম।

এই সাধারণ নিয়মের যে ব্যতিক্রম ঘটে না, এমনটি নয়। মুসলিম জাহানে এমন বহু লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা অসাধারণ জ্ঞানী ও মহান। তাঁদেরকে আমরা মনীষী বলে থাকি। মুসলিম জগতে বহু ক্ষণজন্মা মনীষী জন্মেছেন, যাঁরা শুধু তাঁদের যুগেই নন; বর্তমান যুগেও আদর্শ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয়। কালজয়ী প্রতিভা হিসেবে তাঁরা সর্বজনস্বীকৃত। এই মানব সভ্যতাকে তাঁরা নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কুরআন, সুন্নাহ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, এমন কোনো বিষয় নেই, যেগুলো তাঁদের প্রতিভার জাদুস্পর্শে মানব সভ্যতার দিকদর্শন হয়ে ওঠেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিষয়েই তাঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। বলতে গেলে জ্ঞানের দীপাধারটি তাঁরা জ্বালিয়ে দিয়েছেন, যার আলোকরশ্মি কুসংস্কার তথা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে মানব জাতির সামনে খুলে দিয়েছে জ্ঞানের দুয়ার। যাঁদের সম্পর্কে আমরা বলি,

أولئك أبائى فجئنا بمثلهم
إذا جمعتنا يا جرير المجامع

এঁরাই আমার পূর্বসূরি
এঁদের নিয়ে গর্ব করি
ওহে জারীর! দেখাও তুমি
বিশ্বসভায় তাঁদের জুড়ি ॥

মুসলিম মনীষীদের এই কালোত্তীর্ণ প্রতিভার অফুরন্ত অবদানের পেছনকার মূল নিয়ামক শক্তি ছিল সময়ের মূল্যায়ন। যা সম্পর্কে আমাদের ছেলেমেয়েরা অতি অল্পই জানে। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক; সেই সঙ্গে পীড়াদায়কও বটে। নিজেদের পূর্বসূরি মনীষীদের অবদানের নেপথ্য রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞতা তথা জ্ঞানের এই লজ্জাকর অভাব যত তাড়াতাড়ি পূরণ করা যায়, জাতির জন্য তা হবে ততই মঙ্গলজনক।

হারিয়ে যাওয়া সব কিছুই তুমি আবার পেতে পারো কিন্তু সময়ের বিষয়টি অন্যরকম। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়ার কোনো আশা থাকে না। তাই সময়টা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে দামি সম্পদ। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত তার দিনগুলোকে চমৎকার সম্পদের কৃপণ মালিকের মতো স্বাগত জানানো। বেশি তো দূরের কথা সামান্য সময়ের হেফাযতেও অবহেলা না করা এবং যত কম গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, প্রতিটি জিনিসকে উপযুক্ত স্থানে রাখা।

খাঁটি মুসলমান সময় সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে থাকে। কেননা, সময়টাই তার জীবন। যদি সে সময়টাকে নষ্ট হতে দেয় এবং সময়টাকে ছিনিয়ে নিতে হিংস্র প্রাণীদেরকে সুযোগ দেয়, তাহলে সেটা তার আত্মহত্যার নামান্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। মানুষ দ্রুত আল্লাহর দিকে অগ্রসরমান। পৃথিবীর প্রতিটি আবর্তন একটি নতুন ভোর নিয়ে আসে। এমন পথ নিয়ে আসে, যার মধ্যে কোনো কিছু থেমে থাকে নেই। এই সত্যটা অনুধাবন করা, তাকে নখদর্পণে রাখা এবং তার আগপাছ ভেবে দেখা প্রতিটি মানুষের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত। কাল নিজ গতিতে সফররত, এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তির নিজেকে থেমে আছে বলে মনে করা আত্মপ্রতারণার শামিল। এটা দৃষ্টির ভ্রম। যেমন রেলেন আরোহীর কাছে মনে হয় সব জিনিস চলছে কিন্তু সে নিজে বসে আছে। অথচ বাস্তবতা হলো, কাল মানুষকে তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বরাবরই ইসলাম সময়ের গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়ে থাকে। ইসলাম এই অমূল্য বাণীটিকে সমর্থন করে, 'সময় তরবারির মতো, তুমি যদি তাকে না কাটো তাহলে সে তোমাকে কেটে দেবে।' এই বাস্তবতাটা অনুধাবন করা ও এর নির্দেশনা অনুযায়ী চলা ঈমানের প্রমাণ ও তাকওয়ার নিদর্শন।

ইসলাম তার বড় বড় ইবাদতকে দিনের বিভিন্ন অংশে ও বছরের বিভিন্ন মৌসুমে ভাগ করে দিয়েছে। পাঁচটি নামায পুরো দিনটাকে ঘিরে রাখে। নামাযের সময়গুলোকে দিনের গতির সাথে আবর্তিত হয়। শরীয়তে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতরণ করেছেন নামাযের সময়ের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করার জন্য। যেন একটি সূক্ষ্ম মজবুত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা ইসলামী জীবনকে বিন্যস্ত করবে ও মিনিট দ্বারা পরিমাপ

করবে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ঘূর্ণায়মান আকাশের গতির সাথে দিনের পর রাত আসে এবং রাতের পর আসে দিন। এটা আল্লাহর অনর্থক সৃষ্টি নয়। মানুষের জন্য এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিষয় যে, তার এই বিন্যস্ত পৃথিবীতে তাদের জীবনটাকে বেকার মনে করবে। বস্তুত এটা এক দীর্ঘ প্রতিযোগিতার ময়দান। যে প্রতিযোগিতায় কেবল সেই বিজয়ী হবে যে তার রবকে চেনে। তার অধিকারকে স্মরণ করে, তার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে, যে মহা আরাম লাভের জন্য বছরসমূহের বিরতিহীন আবর্তন-বিবর্তনের সাথে সাথে বিরতিহীন মেহনত ও কষ্টের ধারা অব্যাহত রাখে। তোমার বয়সটা তোমার অনেক বড় পুঁজি। তোমাকে অতিসত্বর এর খরচ ও ব্যয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'কিয়ামত দিবসে বান্দা তার এক কদমও নাড়াতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা না হবে। যথা, তার জীবন কী কাজে ব্যয় করেছে, তার যৌবনকাল কী কাজে ব্যয় করেছে, তার ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে ব্যয় করেছে, তার ইলমের ওপর কতটুকু আমল করেছে।' [আল-মুনযিরী তাঁর 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' গ্রন্থে' (৬/১৮৭) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।]

ইসলাম তার অনেক নির্দেশাবলি ও নিষেধাজ্ঞাসমূহে সময়ের মূল্যের প্রতি লক্ষ রেখেছে। ইসলাম যখন অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকাকে ঈমানের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছে, তখন বেকার ও উদাসীন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায়ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। যারা একে অপরকে ডাকে আর বলে, 'এসো! একটু আনন্দ-ফুর্তিতে সময় কাটাই।' অথচ এই বোকার দল জানে না, এটা জীবন নিয়ে খেলা করার নামান্তর। এভাবে সময় কাটানো ব্যক্তিকে ধ্বংস করে এবং সমাজকে নষ্ট করে। বুদ্ধিদীপ্ত সেই কথাটি আজ মানুষ ভুলে যেতে বসেছে,

الواجبات اكثرُ من الاوْقاتِ الزمنُ لا يَقِفُ مُحايِداً فهو اما صديقٌ ودُود او عَدُو لدود

'সময়ের তুলনায় কাজ অনেক বেশি। সময় নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকে না। সে হয়তো খাঁটি বন্ধু নয়তো ভয়ানক শত্রু।' হাসান বসরী (রহ.) বলতেন,

ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى :يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود منى، فإنى لا أعود إلى يوم القيامة

'প্রতিদিন যখন প্রভাত উদিত হয় তখন সে আহ্বান করে বলে, হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী। সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় গ্রহণে ব্রতী হও। কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত আমি আর কখনো ফিরে আসব না।' [আবু নুআইম প্রণীত 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' : ২/৩০৩]

প্রজ্ঞাদীপ্ত এই কথামালা ইসলামের অন্তর্নিহিত উৎস থেকে নির্গত এবং ইহকাল থেকে পরকালের বৃহৎ জীবনে জন্য উপকার লাভ করার ব্যাপারে ইসলামের মহান শিক্ষার ঝলক। বান্দার অন্তরে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানোর ও এক প্রচেষ্টা থেকে আরেক প্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া আল্লাহর বিশেষ দান ও তার তাওফীকের প্রমাণ। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, সাধারণ মানুষ তাদের সময়গুলো অনর্থক কাজে নষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করে না এবং এই অপরাধের সাথে আরেকটি অপরাধ করে থাকে, তাহলো অন্যের সময়ের ওপর আক্রমণ করে সেগুলোকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। তার কর্মপ্রিয় লোকদের কাছে তাদের একান্ত কাজের সময়ে তাদেরকে মূল্যহীন কাজে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রবেশ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষ প্রতারিত হয়। তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।' [ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে (১১/২২৯, কিতাবুর রিকাক-এর শুরুতে) ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর 'জামে' গ্রন্থে (৪/৫৫০, কিতাবুয যুহদ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে (২/১৩৯৬, কিতাবুয যুহদ, আল-হিকমাহ অধ্যায়)]

ইসলাম যে সময়কে উত্তম পন্থায় কাজে লাগানোর শিক্ষা দিয়েছে, এর অন্যতম প্রমাণ, সে একটি কাজ সব সময় করার নির্দেশ দিয়েছে যদিও কাজটি সামান্য হয় এবং বিচ্ছিন্নরূপে অধিক কাজ করাকে অপছন্দ করেছে। কেননা, অল্প কাজ সব সময় করা ধারণাতীতরূপে সামান্য কাজকেও পাহাড়সম বানিয়ে দেয়। অপরদিকে, হঠাৎ চরম আগ্রহ জাগল আর জানপ্রাণ দিয়ে অধিক পরিমাণে সেটা করতে শুরু করল, কিছুদিন পর ক্লান্ত হয়ে একদম সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকল, ইসলামে এটা অপছন্দ।

ইসলাম যে সময় সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে; এর আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, ইসলাম সকাল সকাল কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। ইসলাম চায়, প্রতিটি মুসলিম তার দিনের কাজগুলো শুরু করুক পূর্ণ উদ্যম ও আগ্রহের সাথে, পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে। কেননা, দিনের প্রথমভাগ দ্বারা উপকৃত হওয়ার আগ্রহ বাকি দিনটা বেকার নষ্ট না করার প্রচণ্ড

আগ্রহ জন্ম দেবে।

ফজর থেকে দিনের শুরুটা নির্ধারণ করে থাকে ইসলাম। সূর্যোদয়ের আগেই পূর্ণ জাগরণকে ফরয সাব্যস্ত করে। ফজরের নামাযকে হাতছাড়া করে দেয়, এমন রাত জাগাকে অপছন্দ করে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে দিনের অগ্রভাগে বরকত দান করো।' [হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন। [এর সনদ দুর্বল, তবে মর্মার্থ বিশুদ্ধ] এটা খুবই মন্দ বিষয় যে, একদল লোক সকাল ১০টা পর্যন্ত ঘুমাবে আর সূর্য উদিত হবে এমতাবস্থায় যে তারা ঘুমের ঘোরে অচেতন থাকবে। অথচ তখন আরেকটি দল তাদের জীবনোপকরণ ও আখেরাতের কল্যাণ সন্ধানে ব্যস্ত। হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন আমি সকাল বেলায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। তিনি নিজের পা মুবারক দ্বারা আমাকে নাড়া দিলেন। এরপর বললেন, হে মেয়ে! উঠে তোমার রবের প্রতিপালকের রিযিক প্রত্যক্ষ করো। তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সুবহে সাদেক ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের রিযিক বণ্টন করেন।' [হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।]

ওই সময়ে অলস ও কর্মঠদের মাঝে পার্থক্য নির্ণিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার যোগ্যতা অনুসারে প্রদান করা হয় দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। জীবনটা অত্যন্ত ছোট। আর বর্তমানকাল, যার আওতায় মানুষ জীবন যাপন করছে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'হে লোক সকল! তোমার সাধ্যমতো আমল করো। কারণ আল্লাহ তা'আলা বিরক্ত হন না যতক্ষণ তোমরা বিরক্ত না হও। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল সেটাই, যা সব সময় হয় যদিও পরিমাণে অল্প হয়।'

কাল এমন একটি আশ্চর্য বিষয় যে, কোনো মেধা তার আসল তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সক্ষম নয়। আমরা কেবল বস্তুর ওপর তার প্রভাব দেখেই তাকে চিনতে পারি। সম্ভবত নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতার রহস্য তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। যুগ ও কালের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি সম্পর্কে যিনি ওয়াকিফহাল তিনিই কেবল সেটা চিনতে পারেন। [খুলুকুল মুসলিম : ২২৩-২৩২, দারুল কলম দামেশক থেকে ১৪০৬ হিজরিতে প্রকাশিত।]

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

উম্মাহর ঐক্য সাধনে রাসূল (সা.)-এর কর্মনীতি

মাওলানা সুহাইলুল কাদের

উম্মাহর ঐক্য :

রাসূল (সা.)-এর সীরাত আমাদের জন্য আদর্শ। তাঁর প্রতিটি কথা, ইশারা, আচরণ ও উচ্চারণ আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয়। রাসূল (সা.)-এর জীবনের বৈপ্লবিক দিকগুলোর অন্যতম হলো, তিনি পুরো উম্মাহকে এক প্ল্যাটফর্মে একীভূত করেছেন। ঈমানের পরিচয় ও কোরআনকে জীবন-বিধান রূপে গ্রহণ করাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ঐক্য গঠিত হয়েছিল। ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য তাদের ঐক্যে সামান্যতমও ফাটল ধরাতে পারেনি। গোত্রের দম্ভ ও ভাষার ভিন্নতা থেকে বের হয়ে 'আমি একজন মুসলিম; আমার দস্তুর হলো কোরআন' পরিচয়টি তাদের মুখে শোভা পেত। ফলে তাদের ঐক্য ও বন্ধন হয়েছিল সুদৃঢ় ও মজবুত। শারীরিক পৃথক হলেও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের কারণে তারা যেন সিসাঢালা প্রাচীর। যুগের সব তাগুত ও ফিরআওনী শক্তি যারা রাসূল (সা.)-এর মিশনকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য আমরণ ছিল, কিন্তু তারা মুসলমানদের ঐক্য দেখে নিজেরা দমে যেত। তাদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ত। অল্প দিনের মধ্যে উম্মাহর ঐক্যের কারণে তাদের সমূহ-শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল। সেকালের পরাশক্তি রোম ও পারস্য, যাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি সবার কাছে স্বীকৃত ছিল তারাও উম্মাহর ঐক্যের সামনে পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছিল। ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের গবেষকগণ রাসূল (সা.)-এর এই বৈপ্লবিক জীবনাংশে দৃষ্টি দিলে থ হয়ে যায়। তারা গবেষণা করে বুঝে উঠতে পারে না যে, যাদের কাছে গোত্রীয় পরিচয় ছিল শ্রেষ্ঠ অভিধা, গোত্রের জন্যই যাদের মাঝে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত, যাদের মতের বিরুদ্ধে গেলে বলত, 'আমরা এই মতের ওপর আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি' তাদেরকে একজন উম্মী নবী কিভাবে পারস্পরিক বিভেদ দূর করে, গোত্রীয় কোন্দল মিটিয়ে তাওহীদের প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করেছেন? ফলে তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে বুকে লালন করে, আল্লাহর জন্য জীবিত থাকা এবং আল্লাহর জন্য জীবন দেওয়ার অকুণ্ঠ প্রেরণা নিয়ে আগে বেড়েছিলেন। তাদের সামনে কায়সার ও কিসরার মতো শক্তিও 'উড়ন্ত ধূলিকণা'র ন্যায় উড়ে গিয়েছে। তারা আল্লাহু আকবার এর ধ্বনি নিয়ে আফরিকা, উন্দুলোস, চীন ও সিন্ধুসহ দূরদূরান্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

সাম্য ও ঐক্যের প্রথম দৃষ্টান্ত :

রাসূল (সা.) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পর সাথে সাথে ইসলামের বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। বরং প্রথমে উম্মাহর মাঝে ঐক্য সাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে উম্মাহকে ঈমানের পতাকাতলে একত্রিত করার লক্ষ্যে আহ্বান করলেন,'হে লোকসকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো; যাতে করে তোমরা সফল হতে পারো।' রাসূল (সা.)-এর এই আহ্বানে ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, আরব-অনারব, আযাদ-গোলাম, যুবক-বৃদ্ধ ও নারী-পুরুষ সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা ছিল রাসূল (সা.)-এর প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা।

'তিনি যে পুরো পৃথিবীর জন্য রহমত' –এই দাওয়াতের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর কোনো ব্যক্তিই তাঁর ডাকের বাইরে নয়। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম যারা ইসলামের শীতল ছায়ায় একীভূত হয়েছেন, তাদের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে সাম্য ও ঐক্যের অনন্য নজির স্থাপিত হয়েছে। কারণ, তাদের মধ্যে সর্বস্তরের লোক বিদ্যমান ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন আজাদ এবং সরদার। খাদিজা (রা.) ছিলেন আজাদ এবং বিত্তবান। আলী (রা.) ছিলেন ছোট্ট বালক। যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) ছিলেন গোলাম। অতঃপর একদিকে যেমন হযরত সুমাইয়া, আম্মার, ইয়াসির, খাব্বাব ও বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতো দুর্বল ও গোলাম ব্যক্তিরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন, ঠিক অন্যদিকে উসমান ইবনে আফফান, তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ, যায়দ ইবনে আরকাম, হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতো আযাদ ও প্রভাবশালী, বিত্তবানরা ইসলামের চাদরে নিজেকে আবৃত করলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে মক্কার সর্বশ্রেণির লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলেন। যে কেউ যখন ইসলাম গ্রহণ করত, পেছনের সব জাহেলী ও শিরকী প্রথাকে ছুড়ে মেরে মুসলমানদের ঐক্যের ঠিকানায় জায়গা করে নিতেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই মক্কার প্রতাপশালী সাহসী যুবক হযরত উমর (রা.) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানদের নতুন শক্তি সঞ্চয় হয়েছিল। আবু জাহলের ঔদ্ধত্যের জবাব দেওয়ার জন্য হযরত উমরই উপযুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকে ডর ও ভীতির আঙিনা থেকে বের করে খোলা ময়দানে কাজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা সত্যের

ওপর এবং মুশরিকরা মিথ্যার ওপর হয়, তাহলে সত্য চুপিসারে থাকবে আর মিথ্যা নির্বিঘ্নে প্রকাশ্যে প্রচারিত হবে–তা তো মেনে নেওয়া যায় না। আমরা কাবা শরীফে প্রকাশ্যে নামায আদায় করব। তখন মক্কার মুশরিকরা ইসলামের ঐক্য ও সমতার অনন্য দৃষ্টান্ত অবলোকন করেছিল। হেরেম শরীফে যে কাতারে আবু বকর, উমর, উসমান ইবনে আফফান ও হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) দাঁড়ালেন। ঠিক সেই কাতারে দাঁড়ালেন আম্মার, ইয়াসির, বিলাল ও সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুম। সবাই একসাথে রুকু করছেন, রবের দরবারে সিজদাহে লুটে পড়লেন–উম্মাহর মাঝে ঐক্য সাধনে এটি ছিল রাসূল (সা.)-এর প্রথম পদক্ষেপ।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি :

রাসূল (সা.) যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন আরবরা ছিল বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত। বংশীয় ও গোত্রীয় পরিচয়ে বহুরৈখিক বিচ্ছিন্নতার শিকার। রাসূল (সা.) তাদেরকে রং, বর্ণ, ভাষা ও গোত্রীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তুলে ঈমানী পরিচয়ে একত্রিত করেছেন। তাদেরকে এমন দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, যেখানে মানুষের রূপ-সৌন্দর্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা, গোত্রীয় সম্মান ও বংশীয় মর্যাদা কোনো পার্থক্যরেখা সৃষ্টি করতে পারে না। বরং ঈমান ও তাকওয়া হলো পার্থক্যের একক মানদণ্ড। তাই রাসূল (সা.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন :

الناس بنو آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى،

সকল মানুষ আদম (আ.)-এর সন্তান। আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। কোনো অনারবের ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের, কোনো কালোর ওপর সাদার, সাদার ওপর কালোর কোনো সম্মান নেই। যদি সম্মান হয়, তা শুধু তাকওয়া ও খোদাভীতির মাধ্যমে হবে। (যাদুল মাআদ)

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে আদম (আ.)-এর সূত্রে সৃষ্টি করেছেন। কালের পরিক্রমায় বংশপরম্পরা বিস্তার হতে থাকে। মানুষের পরস্পরে তফাত হওয়ার জন্য রং ও রূপে ভিন্ন ভিন্ন করেছেন। পরিচয় ও সহযোগিতার সহজতার জন্য গোত্র ও বংশীয় ভাগ করেছেন। কিন্তু সবার মূল হলো আদম (আ.)। আল্লাহ তা'আলা যাকে মাতৃকা থেকে সৃষ্টি করেছেন। মাটি যেহেতু কালো, হলুদ, সাদা, লাল প্রকৃতির রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা সব প্রকৃতির মাটির সমন্বয়ে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাই আদম-সন্তানদের মধ্যে কেউ হয় লাল; কেউ হয় সাদা; কেউ হয় কালো; আবার কেউ হয় হলদে। সেই হেকমতের প্রতি দৃষ্টি রেখে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আর আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।' পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাকো এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা : ১)

আল্লাহ তা'আলা তাকওয়াকে একমাত্র মানদণ্ড আখ্যা দিয়ে বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক-সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। (সূরা হুজরাত : ১৩)

ঐক্য ও সাম্যের মূলনীতি :

রাসূল (সা.) ফিতনা-ফ্যাসাদের তরঙ্গে উত্তাল জাহেলী যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন। তখন রাজা প্রজাকে, ধনী গরিবকে এবং শক্তিধর শক্তিহীনকে জুলুম-শোষণ করা ছিল নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। রাসূল (সা.) জুলুম ও শোষণের করতলে পিষ্ট জাতিকে ন্যায় ও সাম্যের মাধ্যমে একই কাতারে ঐক্যবদ্ধ করার নিমিত্তে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো নীতিকে বিধান রূপে গ্রহণ করেননি। বরং আল্লাহপ্রদত্ত দস্তুর কোরআনকে জীবন বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কেননা, পবিত্র কোরআনে মানুষের সবদিক বিবেচনা করে ন্যায়নিষ্ঠ বিধানই বিধাতার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি মানবরচিত কোনো বিধানকে নীতি-নির্ধারণ করার জন্য চয়ন করা হতো, তাহলে অবশ্যই মতানৈক্য সৃষ্টি হতো। কারণ মানুষের বাহ্যিক রূপ-আকৃতি যেমন অমিল ও বৈচিত্র্যময়; ঠিক তেমনিভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিও বহুরৈখিক ও বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীতে যত সব আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে, তা কেবল ঐশী বাণীকে ব্যতিরেকে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত নীতি গ্রহণ করার কারণে হয়েছে।

মুফতি জহিরুদ্দীন মিফতাহী (রহ.) বলেন, ইসলামের সম্পূর্ণ জীবন-বিধান পৃথিবীর বুকে তখনই অবতীর্ণ হয়েছে,

যখন পৃথিবী ধ্বংসের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছিল। মানুষ মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়েছিল। নিরাপদ জীবনযাপনের কোনো সুযোগ ছিল না। মানবতার এই দুর্দিনে রাসূল (সা.) তাদেরকে সত্যের পথ দেখালেন। তাদেরকে অজ্ঞতা থেকে ইসলামের সৌন্দর্যের দিকে আহ্বান করলেন। যা ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়।

এমনই তো হওয়ার কথা। কারণ, রাসূল (সা.) স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের ইশারায় তা করেছেন। ইতিহাসে চোখ বোলালে আপনি মানতে বাধ্য হবেন, যে জিনিস নিরাপত্তাকে ধ্বংস করে দেয় তা হলো মানুষের সংকীর্ণ মানসিকতা। কেউ দলের জন্য তলোয়ার হাতে নিত। কেউ বংশীয় কারণে যুদ্ধ করত। কেউ সাম্প্রদায়িকতার কারণে অন্যের রক্ত নিয়ে হোলি খেলত। (ইসলাম কা নেজামে আমন : ২৬)

তাই আল্লাহ তা'আলা রং, বর্ণ, গোত্রীয় ও পার্থিব অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব অন্তরে জাগরূক রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই কাতারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কোরআনী জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন। কোরআনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআনী দস্তুর যেহেতু সকল সৃষ্টির স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তাই কালের পরিক্রমায় তাতে কোনো পরিবর্তনের সুযোগ নেই। কালের আবর্তে কোরআনী আইন পুরনো হয় না এবং সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতায় কোনো হ্রাস পায় না। এটি কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারে, যাদেরকে আল্লাহ সঠিক বোধ দান করেন। আল্লাহ তা'আলা এই শাশ্বত জীবন-বিধানকে ভিত্তি করে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন দলে বিভক্তি হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ ঐক্য ও সম্প্রীতির নেয়ামতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

স্বর্ণালি যুগের কিছু গুণাবলি :

রাসূল (সা.) ঈমানী ঐক্য ও মানুষের সমতার ভিত্তিতে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা দ্বারা ইসলাম স্বভাব-ধর্ম হওয়াটা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়। মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা আবুল হাসান আলি নদভী (রহ.) সোনালি যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'রাসূল (সা.) তাদেরকে পশুত্ব থেকে বের করে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করেছেন। যার ওপরে শুধু নবুওয়াতের স্তরটি কেবল বাকি ছিল। আর তা তো রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেক ব্যক্তি একেকটি মুজেযাহ। নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহ থেকে একেকটি নিদর্শন। পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিক একত্রিত হয়ে যদি মনুষ্যত্বের উচ্চ চিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করে, তাদের কল্পনা অতটুকু পৌঁছবে না, বাস্তবিক জীবনে তাঁরা যে স্তরে উপনীত ছিলেন। কারণ, তাঁরা তো নবুওয়াতের সরাসরি সান্নিধ্য এবং নববী দীক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন। আর যারা নববী দরসেগাহ থেকে তরবিয়ত নিয়ে বের হতেন তাঁদের শক্তিশালী ঈমান, গভীর ইলম, কল্যাণ-প্রেমী অন্তর, লৌকিকতা ও নেফাকমুক্ত জীবন, অহংবোধ থেকে দূরত্ব, আল্লাহ-ভীতি, মানুষের কল্যাণ-কামনা, সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি, সাহস ও বাহাদুরী, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ, শাহাদাতের অদম্য স্পৃহা, দিনে অশ্ব চালিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, রাতে ইবাদতে নিমগ্ন থাকা, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা থেকে নিস্পৃহতা, ন্যায়-ইনসাফ এবং পড়শিদের খবর নেওয়া ইত্যকার গুণে পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও কোনো নজির ছিল না। এই সোনালি মানুষগুলো দ্বারাই ইসলামী সমাজ গঠিত হয়েছিল। তাঁদের ওপর ভিত্তি করেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই সমাজ এবং রাষ্ট্র তাদের গুণাবলির প্রতিচ্ছবি ছিল। তাদের মতো তাদের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ সুষ্ঠু, নিরাপদ এবং উন্নত ছিল। দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা সর্বদা তাদের অন্তরে জাগরূক থাকত। তাদের সমাজে ব্যবসায়ীর সততা ও আমানত, অভাবীর স্বচ্ছতা ও কষ্ট, শ্রমিকের মেহনত ও কল্যাণকামিতা, ধনীদের উদারতা ও সহানুভূতি, বিচারকদের বিচক্ষণতা ও ইনসাফ, শাসকদের একনিষ্ঠতা ও আমানতদারি, সর্দারের বিনয় ও নম্রতা, প্রতিশ্রুতিশীল খাদেমের খেদমত, আমানতদার রক্ষকের পর্যবেক্ষণ– সব কিছুর সন্নিবেশ ঘটেছিলা।' (মনসবে নবুওয়াত : ১৭৯-১৮১ সংক্ষেপিত) তাদের গুণকীর্তন করে পবিত্র কোরআনে বিবৃত হয়েছে :

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। (সূরা ফাতাহ : ২৯)

অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (সূরা নূর : ৩৭)

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাহচর্যদের সম্পর্কে বলেন :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

মুমিন মুমিনের জন্য প্রাসাদস্বরূপ। যার একাংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় রাখে। এ বলে তিনি উভয় হাতের আঙুলসমূহ বিজড়িত করলেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬০২৬)

ঐক্যে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ :

ঐক্যের অপর নাম শক্তি। বর্তমান বিশ্বে মুসলমান নানা দলে-উপদলে বিভক্ত। মুসলমানের একতার বন্ধন একেবারে ভঙ্গুর। অথচ পবিত্র কোরআন বহু আগেই বলে দিয়েছে, বিভক্তির কারণে শক্তি হ্রাস পায়। মনোবল ভেঙে যায়। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য করো এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা করো, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো।

ইসলাম চাই মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের বন্ধন হোক সুদৃঢ় ও মজবুত। তাই ইসলামে ঐক্যের প্রতি আহ্বান করার সাথে সাথে অনৈক্য সৃষ্টিকারী এবং পরস্পরে সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় বিঘ্নকারী বস্তু থেকে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মাঝে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টিকারী কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টিকারী বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

১. আসাবিয়্যাত তথা দলীয় মনোভাব :

মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বিনষ্টকারী বস্তুর অন্যতম হলো আসাবিয়্যাত। আসাবিয়্যাতের কারণে মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। রাসূল (সা.) শুধুমাত্র গোত্রীয় মনোভাব ও দলীয় কারণে বিভক্ত হওয়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। রাসূল (সা.) বলেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ .

যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে অর্থাৎ গোত্র কিংবা দলের দোহাই দিয়ে আহ্বান করে লোকদেরকে সমবেত করে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর ওই ব্যক্তিও আমার দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাতের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে এবং সেও নয় যে আসাবিয়্যাতের ওপর মারা যায়। (আবু দাউদ : হাদীস নং-৫১২১)

২. ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মন্দ নামে সম্বোধন :

কেননা, এর কারণে একে অপরের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরে। তাই পবিত্র কোরআনে অন্যকে উপহাস করা ও মন্দ নামে ডাকা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই জালেম। (সূরা হুজরাত : ১১)

৩. মন্দ ধারণা, গিবত, ছিদ্রান্বেষণ, রাগ ও হিংসা :

কেননা, এগুলোর কারণে মুসলমানদের মাঝে পরস্পরে দূরত্ব ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। আর পরস্পরে বিভেদ সামাজিক ঐক্যের অন্যতম অন্তরায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজরাত : ১২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। ধারণা বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা দোষ তালাশ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬০৬৪)

ঐক্য সুদৃঢ়কারী বস্তুসমূহ :

যেসব কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্পর্ক সুসংহত হয়, ইসলামে তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা পারস্পরিক ঐক্য সুদৃঢ়কারী বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

১. সম্মিলিত ইবাদতসমূহ :

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে এসে জামাআতের সহিত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাপ্তাহিক জুমু'আবারে নিজ অঞ্চলের সকলকে জুমু'আ মসজিদে এসে জুমু'আ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাৎসরিক দুই ঈদে কাছাকাছি সব এলাকার লোক বড় ময়দানে সম্মিলিত হয়ে ঈদের নামায আদায় করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আর হজের সময় সারা বিশ্বের সামর্থীবান সকল মুসলিমকে আরাফার ময়দানে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পাশাপাশি যেন মুসলমানের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকে–তাই হলো এই সম্মিলিত ইবাদতের অন্যতম লক্ষ্য।

২. ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতা :

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাব পূরণ করবেন? যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪২)

৩. প্রতিবেশীর খোঁজখবর রাখা :

রাসূল (সা.) বলেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ

যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করে সে (পূর্ণ) ঈমানদার নয় (দাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১১১)

৪. উত্তম ধারণা পোষণ করা :

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন :

حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

উত্তম ধারণা পোষণ উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৯৩)

৫. আতিথেয়তা :

মেহমানকে সাধ্যমতো আপ্যায়ন করা সুন্নাত। তবে সাধ্যের বাইরে কৃত্রিমভাবে অতিরঞ্জন করা নিন্দনীয়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন :

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৩৬)

তাছাড়া সালাম-মুসাফাহা, দানশীলতা, হাদিয়া দেওয়া, হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা ইত্যাদিসহ অগণিত অনেক ইবাদত রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে পারস্পরিক ও সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

সাহাবা যুগে ঐক্যের প্রতিফলন :

ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল স্বর্ণালি যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সর্বশেষ সারিয়্যায় আজাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর অল্পবয়স্ক ছেলে উসামার নেতৃত্বে হযরত উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমসহ অনেক সাহাবা একই কাতারে যুদ্ধে করেছিলেন। হযরত বেলাল হাবশী (রা.) মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লাহর ছাদে উঠে উচ্চকণ্ঠে আজান দিচ্ছিলেন। আর মুশরিক সর্দাররা বলছিলো, 'এই দৃশ্য দেখার চেয়ে আমাদের তো মরে যাওয়াই শ্রেয়।' সিরিয়া-বিজেতা হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) বলতেন, 'ওহে লোকসকল! আমি কুরাইশ বংশের একজন সদস্য মাত্র। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাকওয়ার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হও, আমি তার মতো হতে পছন্দ করি। সে কালো বর্ণের হোক; কিংবা লাল।'

আমাদের করণীয় :

সমকালীন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলছে। কাফেরদের নিপীড়ন ও পাশবিক আচরণ জাহেলী যুগের বীভৎস চিত্রকেও হার মানায়। মুসলমানগণ নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রতিরোধ করে টিকতে পারছে না। তার অন্যতম কারণ, আমরা রাসূল (সা.) সীরাত ও সাহাবাদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছি। পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যপূর্ণ ঐক্য ব্যতিরেকে সমস্যা সমাধান করতে চাচ্ছি। যে ঈমানী ঐক্য শক্তি ও সাহসের মূল ভিত্তি; সাহাবায়ে কেরাম যে ঐক্যের ভিত্তিতে রং-বর্ণ, দল-মত ও গোত্রীয় সীমাবদ্ধতা ভুলে গিয়ে সিসাঢালা প্রাচীর হয়ে দ্বীনের জন্য সর্বস্ব বিলীন করেছিলেন আমাদের জন্য সেই ঐক্য এখন শুধু ইতিহাস। আমরা যদি দলীয় মনোভাব ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠে ঈমানকে ভিত্তি বানিয়ে, স্বর্ণালি যুগের সোনালি মানুষদের গুণে গুণান্বিত হয়ে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত হই, তাহলে এই অবক্ষয়ের যুগে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : হালাল পণ্য

মুহাম্মদ নাজমুল হাসান
ভাটারা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১. বিভিন্ন খাবার দুধ, বিস্কুট, কোল্ড, ড্রিংকস, মিষ্টান্ন ইত্যাদি প্রাণ কম্পানি হালাল কি না বোঝার উপায় কী? এবং পান, সুপারি, চুন, জর্দা, খয়ের ইত্যাদি খাওয়া বৈধ কি না? এবং বিভিন্ন দোকান থেকে জিনিস ক্রয় করতে দাম জিজ্ঞাসা করা সুন্নাত কি না?।

২. টিকা, ইনজেকশন, অপারেশন নামে কী দেয় তা জানা জরুরি কি না? বা হালাল-হারাম বোঝার উপায় কী? এবং বেশির ভাগ ক্লিনিক-হাসপাতালে পুরুষ ডাক্তার উক্ত কাজ করে থাকেন, মহিলা বা মেয়ে রোগীদের ব্যাপারে কিভাবে শরয়ীভাবে চিকিৎসা করানো যায় এবং চিকিৎসা বা ওষুধ সেবন সুন্নাত কি না?

সমাধান-১ :

কোনো ব্র্যান্ড বা সাধারণ কম্পানির যে কোনো খাবারে হারাম কোনো কিছুর সংমিশ্রণ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা বৈধ, তবে সন্দেহযুক্ত হলে বর্জন করা যেতে পারে।

পান, সুপারি, চুন, জর্দা, খায়ের ইত্যাদি খাওয়া মুবাহ, তবে এগুলোর কোনোটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে পরিহার করা জরুরি।

কোনো কিছু ক্রয় করার সময় দেখেশুনে ক্রয় করা সুন্নাত একাধিক দোকান দেখার প্রয়োজন নেই। আরো কম পাওয়ার আশায় একাধিক দোকান দেখতেও কোনো অসুবিধা নেই।

(কাওয়ায়েদুল ফিকাহ-৯২, রদ্দুল মুহতার-১/১৫১, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম-১৫/৯৬)

সমাধান-২ :

টিকা, ইনজেকশন ও অপারেশনে ব্যবহৃত মেডিসিন হারাম ও অপবিত্র প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত হালাল ও পবিত্র। আর প্রমাণিত হলে অপারগ অবস্থায় দেওয়া যাবে।

মহিলাদের চিকিৎসা মহিলা ডাক্তার দ্বারা করাবে, তা সম্ভব না হলে বা পুরুষের চিকিৎসা বেশি ফলপ্রসূ হলে পুরুষ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করানোর অবকাশ আছে।

চিকিৎসা বা ওষুধ সেবন করা সুন্নাত।

(সুনানে তিরমিযী-৬৮৯, আল বাহরুর রায়েক-৮/৩৫২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/১৭৭)

প্রসঙ্গ : মুসাফিরের নামায

মুহাম্মদ আহমাদুল্লাহ
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

যদি কোনো ব্যক্তি ত্রিশ অথবা চল্লিশ দিনের প্যাকেজে হজ করতে যায় তাহলে তিনি মক্কা, মদিনা, মিনা, মুযদালিফা এবং আরাফায় মুকিম হিসেবে নামায পড়বে? না মুসাফির হিসেবে?

সমাধান :

বর্তমানে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে মিনা এবং মুযদালিফাকে মক্কা শহরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিধায় অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের দৃষ্টিতে কোনো হাজি সাহেব যদি একত্রে উক্ত জায়গাগুলোতে পনেরো দিন বা তার চেয়ে বেশি থাকার নিয়্যাত করে তাহলে সে মুকীম হিসেবে গণ্য হবে এবং নামায পুরা পড়বে। অন্যথায় কসর করবে।

আর মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ শরয়ী সফরের দূরত্বে অবস্থিত বিধায় মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ গিয়ে পনেরো দিন বা তার চেয়ে বেশি থাকার নিয়্যাত করলে নামায পুরা পড়বে। অন্যথায় কসর করবে।

(রদ্দুল মুহতার-২/১২৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৪০, আল বাহরুর রায়েক-২/২৩৩)

প্রসঙ্গ : জবাই

মুহাম্মদ ইয়াসিন
বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।

জিজ্ঞাসা :

দুম্বা জীবিত থাকা অবস্থায় তার নিতম্বের গোশত কেটে খাওয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত?

সমাধান :

জবাই করা ছাড়া জীবিত দুম্বার নিতম্ব থেকে গোশত কেটে খাওয়া হারাম।

(জামে'য়ুত তিরমিযী-হা. ১৪৮০, সুনানে ইবনে মাযাহ-হা.৩২১৭, আদ্দুররুল মুখতার-৬/৪৭৩)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহাম্মদ সাদ্দাম হুসাইন
বাঘা, রাজশাহী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকার মসজিদের নিচের ফ্লোর যখন মাটির ছিল, তখন ইমামের নামাযের জায়গা ইট দিয়ে প্লাস্টার করা ছিল। অতঃপর আমরা যখন মসজিদের পুরো জায়গাটা টাইল্‌স করি তখন মেহরাবের ইটগুলো না সরিয়েই চাইল্‌স করে ফেলি, যার ফলে ইমাম সাহেবের নামাযের জায়গা মুসল্লিদের নামাযের জাযগা থেকে ৩-৪ ইঞ্চি উঁচু থেকে যায়। এখন অনেকে বলে এভাবে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে না। এখন আমার

জানার বিষয় হলো : এভাবে নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে কি না?

সমাধান :

ইমামের স্থান মুক্তাদিদের স্থান থেকে ৩-৪ ইঞ্চি উঁচু হলেও ইক্তিদা সহীহ হয়ে যায়, তাই উক্ত মসজিদের ইমাম ও মুসল্লি সকলের নামায আদায় হয়ে যাবে।

(ফাতহুল কাদির-৪২৬, মারাক্বিউল ফালাহ-১৩২, মাজমা'উল আনহার-১/১৮৮)

প্রসঙ্গ : মান্নত

মুহাম্মদ রুবেল
সুনামগঞ্জ, সিলেট।

জিজ্ঞাসা :

এক মহিলা এই মর্মে মান্নত করে যে আমার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠলে আমি এক খতম কোরআন শরীফ পড়াব। আল্লাহর মেহরেবানিতে তার ছেলে সুস্থ হয়ে ওঠে। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

১. উক্ত খতমটি টাকার বিনিময়ে পড়া এবং পড়ানো জায়েয হবে কি না?

২. উক্ত মহিলার কোনো আলেম ছেলে ওই খতম পড়ে টাকা নিতে পারবে কি না?

৩. ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পঠিত কোরআন খতমে যদি কোনো ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে এবং উক্ত খতম না পড়া সত্ত্বেও খতম পড়ানেওয়ালা ব্যক্তি তার জন্য একটি অংশ রেখে দেয় তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

সমাধান ১-২ :

কোরআন শরীফ খতম করানোর মান্নত করলে তা সংঘটিত হয় না। তাই উক্ত মান্নত পুরা করাও জরুরি নয়।

(রদ্দুল মুহতার-৩/৭৩৮, আহসানুল ফাতাওয়া-৫/৪৫০)

সমাধান-৩ :

ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম পড়ে বিনিময় গ্রহণ করা উপস্থিত-অনুপস্থিত কারো জন্যই জায়েয হবে না।

(রদ্দুল মুহতার-৬/৫৬, কিফায়াতুল মুফতি-১১/৫২১)

প্রসঙ্গ : হাদীসের ব্যাখ্যা

আব্দুল আলী
ইন্দিরা রোড, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

বোখারী শরীফের হাদীস ৬২৬৭, ২৮৫৬ এবং মুসলিম শরীফের হাদীস ৩০ মুয়ায বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, কেউ যদি আল্লাহর হক যেমন সকল প্রকার শিরক থেকে বাঁচার চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। এর মানে কি বান্দা সকল প্রকার শিরক থেকে বাঁচার চেষ্টার কারণে অন্যান্য সকল কবিরা গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং আমল যদি না থাকে তবুও। এর মানে সরাসরি জান্নাত এবং কবরের আযাবও মাফ করবেন? আল্লাহ যেহেতু মাফ করে দেবেন তাহলে কেন আমল করবে এবং শিরক ছাড়া অন্যান্য কবিরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে?

সমাধান :

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তার বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য। সুতরাং যারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলবে তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা হলো তাদেরকে সরাসরি জান্নাত দান করবেন। পক্ষান্তরে যারা শুধু ঈমানদার, নেক আমল করে না এবং গোনাহ বর্জন করে না তাদেরকেও জান্নাত দান করবেন, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন যাকে ইচ্ছা সকল গোনাহ মাফ করে সরাসরি জান্নাত দান করবেন। আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেওয়ার পর জান্নাত দান করবেন। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত মুয়ায বিন জাবাল (রা.)-এর হাদীস থেকে বোঝা যায় যে মু'মিন বান্দা যদি শিরক থেকে বেঁচে থাকে অন্যান্য গোনাহতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, শাস্তি দেবেন না। অথচ অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা বোঝা যায় গোনাহগার মু'মিন বান্দাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে গোনাহগার মু'মিন বান্দাদেরকে ওই রকম কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন না যেমন কষ্টদায়ক শাস্তি কাফের-মুশরিকদেরকে দেবেন।

(সূরাতুন নিসা-১১৬, সহীহুল বোখারী-হা. ৬৫০০, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-৬/১৪)

প্রসঙ্গ : যাকাত

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

জিজ্ঞাসা :

আমার পাঁচজন বন্ধু মিলে শহরে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের ছেলেদের উদ্দেশ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও সিসি ক্যামেরায় পরিচালিত নূরানী ও হিফজখানা মাদরাসা নির্মাণ করেন। এখন এই মাদরাসায় কোনো প্রকারের দান, সদকা ও যাকাতের টাকা নেওয়া এবং মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?

সমাধান :

বর্ণিত মাদরাসায় যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত গরিব ছাত্র থাকলে শুধুমাত্র তাদের জন্য যাকাত ও সদকার টাকা গ্রহণ করা যাবে, অন্যথায় যাকাত ও সদকার টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

পক্ষান্তরে যাকাত ও সদকা ব্যতীত সাধারণ দানের টাকা মাদরাসার নির্মাণকাজ বা উন্নয়নমূলককাজে ব্যবহার করার জন্য নেওয়ার অনুমতি আছে।

(আদ্দুররুল মুখতার-১/১৪০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২০৭, বাদায়েয়ুস সানা-২/৪৫৬)